তিনি ভাবিলেন "যা বলি, তাতেই যখন রাজি হয়, তখন বোধহয় কোন ফাঁকি আছে, বই বিক্রী হইবে না।" নিশ্চয়ই এইরূপ আশঙ্কায় তিনি শেষে আমাকে বজ্রপাতের ন্যায় এই সংবাদ অতি সংক্ষেপে জানাইয়া লিখিলেন "বই এখন নেওয়ার আমার সুবিধা হইবে না।" মনে আছে সেদিন শনিবার, আমার সম্বল আর তিনটি রৌপ্যচক্রে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। "কাল চলিয়া যাইবে, কিন্তু পরশ্ব কি গতি হইবে।" এই ভাবিতে লাগিলাম। স্ত্রীকে এ সকল কথার কিছুই বলি নাই। টাকার ভাবনা কোন কালেই আমার মনের উপর বড় বেশী অত্যাচার করে নাই। সেদিন ও বেশিক্ষণ ভাবিলাম না। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। আহার প্রস্তুত হইয়াছিল, পেটের অসুখের ভান করিয়া খাইলাম না, স্ত্রীকে খাইতে বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। ভাবিলাম সংসারের কোন কাজে আমাকে ভগবান লাগাইবেন না—যখন পশুর মতই যদি জীবন রক্ষা করিতে হয়, তখন দূর্ব্বাঘাসের চিন্তা করিলে কি হইবে? আমার নিজ পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান করিবার সামর্থ্য নাই—তিনটি শরণাগতকে আশ্রয় দিয়াছি, তাহাদিগকে ক্ষুধার সময় বলিতে হইবে, অন্যত্র যাইয়া খাও, আজকাল গেলে পরশ্বই আমার এই অবস্থায় পড়িতে হইবে, তখন এ জীবনের জন্য আমার দুশ্চিন্তা কেন? আমি উপলক্ষ্য হইয়া থাকিতে চাই না, তোমার ভার তুমি লও।" এই ভাবিয়া চক্ষু বুজিলাম, বুঝিলাম, দুই গণ্ড অশ্রুতে ভাসিয়া গেল। মা বাবাকে মনে পড়িল; মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। "যে যেখানে দেবতা আছ, আমাকে লজ্জা হইতে রক্ষাকর—আমি সারা জীবন কুলির মত খাটিয়াছি, প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়া অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি, এখন ছেলেকে স্ত্রীকে বলিব, আজকার চাউল হইবে না, এই নিদারুণ লজ্জা পাইবার পূর্ব্বে আমার প্রাণ লও, এই

অশান্তি হইতে আমাকে শান্তিধামে লইয়া যাও।" আমার সমস্ত প্রাণ আবার ব্যাকুল হইয়া হরিনামের আশ্রয় লইল। আমি প্রত্যেক বার আমার নাম দেবতাকে অশ্রু অভিষিক্ত করিতে লাগিলাম। মনে শান্তি আসিল, এমন একটা ভাব উপস্থিত হইল, যাহাতে সুখ দুঃখ কিছু নাই, জীবনমরণের চিন্তানাই—কেবলই মধুর। "মধুরং মধুরং" তাঁর নাম আমার নিকট অমৃতের অমৃত বলিয়া মনে হইল। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলাম। আমার স্ত্রী ভাত খাইয়া দুঃখার্ত্ত ভাবে আসিয়া বলিলেন,"পেটের অসুখ কি কমিয়াছে? চারটি ভাত খুব নরম করিয়া রাঁধিয়া দিব কি?" আমি স্ত্রীর মুখ দেখিয়া কি এক আনন্দ পাইলাম! ছেলেদের দেখিয়া কি এক আনন্দ পাইলাম! বড় দুঃখের পঙ্কে এই আনন্দ পঙ্কজ জন্মিয়াছিল—ইহা জীবন সমস্যার এক অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত সুখের সমাধান।

এই সময় ছয় বৎসরের শিশু কিরণ একখানি চিঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। আমাকে বলিল "রেজেষ্টী চিঠি, সই দাও।" চিঠি খুলিয়া দেখিলাম, সোদর তুল্য সুহৃদ কুমুদবন্ধু বসু আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি চাঁটগাঁ ডিভিসনের স্কুলের এসিসট্যান্ট ইনস্পেকটর "দীনেশ দীনু বাবুর সারকুলার দেখাইয়া আমি তোমার পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছি, এই সঙ্গে দেড়শত টাকার নোট পাঠাইলাম। তুমি ৩০০ বই পার্শ্বেলে পাঠাইয়া দিবে, বই পাইলে বাকী দাম পাঠাইব,—একজন ভদ্রলোক এই জন্য খাটিতেছেন, তাঁহাকে ৫০৲ টাকা কমিসন দিতে হইবে। আমার ডিভিসনেই এই ৪০০ বই কাটিয়া যাইবে। সুতরাং তুমি আমার নিকট ১০০০ টাকা পাইবে।" দেড় শত টাকার নোট গুণিবার সময় চক্ষু হইতে অশ্রুর বেগ কিছুতেই থামাইতে পারিলাম না, স্ত্রীর দিক হইতে মুখ সরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিলাম। এ পত্র কুমুদ বাবুর না কাহার বুঝিতে পারিলাম না; কুমুদবাবুকে হরকরা বলিয়া মনে হইল। আমার

মনের দুঃখ কে যেন কি ভাবে জানিতে পারিয়া তাঁহার দয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। কে যেন কানের কাছে চুপে চুপে বলিলেন "আমি আছি।"

কুমুদবাবুর স্নেহের কথা কি বলিব? কুমিল্লায় যখন নিতান্ত পীড়িত হইয়াছিলাম তখন তিনি ছুটি লইয়া দুইবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দুইবারে তাঁহার নিজের পকেট হইতে পাথের প্রায় ১০০ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তিনি আমার আনন্দের সঙ্গী ছিলেন, দুঃখের দুঃখী ছিলেন, এখনও তিনি তাই আছেন। যখন ইংরাজীতে History of Bengali Language and Literature লিখি, তখন তিনি দেড়মাস বাড়ীঘর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া আমার কাছে ছিলেন, তিনি ইংরাজীতে বিশেষ প্রাজ্ঞ, পুস্তকখানির আদ্যন্ত ভাল করিয়া পড়িয়া দিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থানে ইংরাজী শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনজন শরণাগতের কথা লিখিয়াছি। যখন আমি নিতান্ত অভাবে ছিলাম—তখন একদিন বাঁকুড়াজেলা পাত্রসায়ের গ্রামবাসী রামকুমার দত্ত (তন্তুবায়) আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "বাবু, আমি আমার স্ত্রী ও একটি সাত বছরের ছেলে আজ দুই দিন কিছু খাই নাই, আমাদের একটু আশ্রয় দেবেন কি? যদি চাকর করিয়া রাখেন তবে আমাকে তিনটি টাকা মাহিনা দেবেন, আর দুইজনকে কিছু দিতে হবে না, তারা শুধু খাইয়া পরিয়া থাকিবে, এবং কাজ করিবে।" হেম বলিল "না, বাপু, এখানে হবে না; বাবু নিজেই পরিবার পাল্‌তে পারেন না, শয্যাগত কাতর; আবার তোমাদের তিনজন চালাইবেন কি করিয়া?" আমি বলিলাম "না হেম, থাকৃতে দে; আমাকে যিনি পালন কচ্ছেন ওদেরেও তিনি কর্‌বেন। আমি তো আর নিজে রোজগার কচ্ছি না যে নিজের ইচ্ছানুসারে কাউকে তাড়িয়ে কাউকে রাখব। তিনি যখন এদের পাঠাইয়া

দিয়াছেন—আমাকে দীনহীন জানিয়া ও এই পাড়ার এত লোক থাকতেও আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন আমি ইহাদের কিছুতেই তাড়াইয়া দিব না, ইহারা তাঁহার অসময়ের দান।"

রামকুমারকে আমি পুথি সংগ্রহ কার্য্য শিখাইয়াছিলাম। হরপ্রসাদ বাবু, চিত্তরঞ্জন দাশ, নগেন্দ্রনাথবসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়দের নিকট আমি চিঠি লিখিয়া ইহাকে পুস্তক ও প্রাচীন চিত্র-সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়া দেই। সি, আর, দাশের বাড়ীর সমস্ত বাঙ্গলা প্রাচীন পুথি, নগেন্দ্র বাবুর ও সাহিত্য পরিষদের প্রায় সমস্ত পুথি ইহার সংগৃহীত। বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত ছবি শুদ্ধ প্রাচীন পুথির পাটা ও হাতীর দাঁতের প্রাচীন মূর্ত্তি অবনীন্দ্র বাবু ইহাকে দিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর পুঁথিগুলি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্রয় করিয়াছেন। রামকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বিস্তর পুস্তক বিক্রয় করে, গত বৎসর সে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। তাহার ছেলে অবিনাশচন্দ্র দত্ত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুঁথি সংগ্রহ করিতেছে, এবং আজ কালকার বাজারে তাঁত চালাইয়াও রোজগার করিতেছে, তাঁতীর ছেলেকে আমি নিজের ব্যবসায় ভুলিতে দেই নাই। রামকুমারকে আমি এমনই তৈরী করিয়া দিয়াছিলাম যে সে মাসে ১৫০।২০০, শত টাকা ও রোজগার করিয়াছে।

আরও পাঁচ ছয় মাস পরে অর্থাৎ পীড়া সুরু হইবার প্রায় একবৎসর পরে আমি একটু একটু হাঁটিতে পারিতাম, হয়ত ২।৩ মিনিট, তা আবার যখন শরীর খুব ভাল থাকিত তখন,—অধিকাংশ সময়ই আমি বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। একদিন আমি রাজাবাগান জংসন রোড দিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম; আমার বাসা বাড়ী হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ২।৩ মিনিটের পথ। যেখানে আসিয়া আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার সম্মুখেই শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখরকালীর ডিসপেন্সরী;

তিনি আমাকে দেখিয়া আহ্বান করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম "সুয়াপুর, ঢাকা" তিনি বলিলেন, "আপনার পিতার নাম কি ঈশ্বরচন্দ্র সেন?" আমি অনুকূল উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন?" তিনি বলিলেন "আমি তাঁহার নিকট পড়িয়াছি, যখন ছাত্র ছিলাম; তখন তাঁর বয়স আপনার মতই ছিল, আমার আপনাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, ঠিক মাষ্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন।" ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা কিছু ছিল না। শৈশব হইতে আমি অনেকবার ঐরূপ কথা শুনিয়া আসিয়াছি, একবার মানিকগঞ্জ রাস্তায় বেড়াইতে ছিলাম, তখন আমার বয়স আট নয়, সেই সময় দুইজন মুন্সেফ ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। একজন আমাকে দেখিয়া অপরকে বলিলেন "এ ছেলেটি ঈশ্বর বাবুর ছেলে না হইয়া যায় না, কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!" তার পর তাঁরা আমাকে ডাকিয়া অনেক মুন্সেফী জেরা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অরুণের জ্বর হইল। চন্দ্রশেখর বাবুকে ডাকাইলাম। তাঁহাকে ফি দিতে গেলে তিনি বলিলেন, "ভাই, তুমি যে সপরিবারে আমার বাড়ীতে উঠ নাই, এতেই আমাকে অনেক খরচ হইতে মুক্তি দিয়াছ। কারণ তুমি সবটি শুদ্ধ আমার বাসায় গেলে আমার সাধ্য থাকৃত না তোমাকে নিষেধ করা, তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তা তুমি জাননা"। চিরদিনই তিনি আমাকে উপকার করিয়া আসিয়াছেন। কতবার অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। গত বৎসর আমার স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। তিনি অসমর্থ শরীরে বেহালা যাইয়া আমার রথাকৃতি ত্রিতল বাড়ীর ছোট সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধতলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়াছেন, একবার নহে, বহুবার। শৈশবের স্মৃতি মধুর ভাবে তার হৃদয়ে আঁকা আছে, তাঁহার বাড়ী ধামরাই-গ্রামের কথা বলিতে গেলে আর কথা

ফুরাইতে চায় না। এখন তাঁর চেহারাটি ঠিক শিব ঠাকুরের মত হইয়া গিয়াছে; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; আবক্ষ-লম্বিত দাড়ি, সবগুলি পাকিয়া গিয়াছে, মুখের কৌমার্য্য এ বয়সেও কমে নাই; চোখ নাকের গড়ন প্রতিভা-সূচক, এতবড় একটা লাঠি লইয়া যাতায়াত করেন যে সেটি চাঁদ সদাগরের হিন্তালের প্রসিদ্ধ লাঠির সঙ্গেই তুলনা হইতে পারে। বাঙ্গালী সৈনিকের ইতিহাস-বিশ্রুত রায়বাঁশের পরে সেরূপ লাঠি আর কেহ ব্যবহার করে নাই। পুলিসের রেগুলেসন লাঠির মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে চন্দ্রশেখর বাবুর লাঠি। রুদ্রাক্ষমালা গলায় পরেন, কপালে সময়ে সময়ে রুলী থাকে; দাড়ী গোঁপ, রুলি, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি আসবাবের সহযোগে লম্বোদর গজাননের মত মূর্ত্তি খানি দেখিলে মনে হয় এখন মন্দির তৈরী করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেই হয়। বৎসর ৫।৭ হইলে আমি উহাঁর বাড়ীতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে বাঙ্গলায় প্রথম হইবে তাহার জন্য বৎসর, বৎসর একটি স্বর্ণপদকের মূল্য ২০০০, টাকার চেক লইয়া আসিয়াছিলাম। উহা তাঁহার পিতা ও মাতার নামাঙ্কিত।

অরুণ জরে ৩৫ দিন ভুগিয়া পথ্য পাইল। চন্দ্রশেখর বাবু রোজই আসিতেন। আমি নিদারুণ রোগে কাতর, তারপর সারারাত্র অরুণের শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া বসিয়া থাকিতাম। কি কষ্ট যে গিয়াছে তাহা আর কি বলিব! ইহার মধ্যে একদিন চন্দ্রশেখর বাবুর বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে গিয়াছিলাম, আমি শুধু গায়ে চটী পায়ে যাইয়া তাঁহার বাহির বাড়ীতে বসিয়াছিলাম, দেখিলাম কয়েক জন যুবক কথোপকথন করিতেছেন। তার মধ্যে একটি বিএ উপাধিধারী তরুণ যুবক খুব আসর জমকাইয়া বঙ্গভাষার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে এরূপ অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যাতেছেন যে অপর যুবককেরা হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের কথা যেন গিলিয়া খাইতেছেন। বিষয়টিতে আমি একটু

আকৃষ্ট না হইয়া পারিলাম না। হঠাৎ একটা কথার মুখে আমি বলিলাম "মহাশয়। আপনি যে সকল কথা বলিতেছেন—তাহা ভুল?" তিনি ক্ষেপিয়া গিয়া ভুল দেখাইতে বলিলেন, আমি দুইচারিটি কথায় তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, "একথাই নয়, দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষায় যাহা লেখা আছে,আমি তাহাই বলিয়াছি.ঐ বই এখন অথরিটি, আপনি নিশ্চয়ই উহা পড়েন নাই।" আমি বলিলাম "ঐ পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর নূতন কতকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেই তত্ত্বগুলির আলোকে বইখানির সংশোধন আবশ্যক।" এই কথায় বক্তা খুব চটিয়া গেলেন, বলিলেন "দীনেশ বাবুর উপরে সংশোধন?" অপরাপর যুবকেরা বলিলেন "ও কথা বল্‌বেন না মহাশয়, দীনেশ বাবুর পুস্তকে প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়াছে।" যখন তাঁহারা এইভাবে কলরব করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাকে নিরস্ত করিয়া দিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্রশেখর বাবু তাঁহার ভুঁড়ি পুরোভাগে করিয়া স্মিতমুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "এই যে দীনেশ! কতক্ষণ হল এসেছ?" এবং যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝি এঁকে চেন না। ইনি হচ্ছেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দীনেশচন্দ্র।" তখন যুবকদের অনেক সৌজন্য ও ক্ষমা-প্রার্থনা দ্বারা আমি অভিনন্দিত হইলাম।

এই সময় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আমার বাড়ীতে আসিয়া অনাহূত ভাবে আমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে পরিশ্রমের কথা অনেক প্রসংশোক্তি দ্বারা বাড়াইয়া বলিলেন, "আমাদের যথাসাধ্য সহায়তা করা উচিত। আপনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে চান, তাহার সম্পূর্ণ ভার আমি লইব। আর যদি আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসার মত হয়, তবে বলুন, আমি বিজয়রত্ন সেন মহাশয়কে আনিয়া আপনার চিকিৎসায় নিযুক্ত

করিয়া দেই, আপনার কোন খরচ লাগিবে না; তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। ভগবান যে কতদিকে কতজনের দ্বারা আমার খোঁজ লইতেছিলেন! মারিয়া ধরিয়া মাতা যেরূপ শিশুকে স্তন্য দান করেন, আমাকে যে সেইরূপ রোগযন্ত্রনা দিয়া যেন আবার স্নেহার্দ্র হইয়া চুম্বন পূর্ব্বক নিজের অসীম দয়া বুঝাইয়া যাইতেছেন, তাঁহার সেই দয়া যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

কবিরাজী চিকিৎসারই মত হইল, নীলরতন বাবু বিজয়বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। বিজয় বাবুর পুত্র হেমচন্দ্র বিদ্যমান, হেমচন্দ্র যদি আর একটু দীর্ঘ হইতেন, ও তাঁহার মুখ চোখের যদি আর একটু দীপ্তি বেশী থাকিত, তবে তাঁহাকে ঠিক পিতার প্রতিচিত্র বলিয়া মনে হইত, এখনও খুব আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, সন্দেহ নাই।

বিজয় কবিরাজ মহাশয়ের উদারতার ঋণ কি করিয়া ভুলিব? যাঁহারা আমার বিপদের সময় অযাচিত ভাবে আমার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কি করিয়া শোধ করিব? অনেকে তো আমার ঋণ পাশে বদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যিনি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমার ভার দিয়াছিলেন, তাঁহার চরণপদ্মে কোটী নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাদের মঙ্গল কামনা ভিন্ন আমি আর কি করিতে পারিয়াছি!"

এই সময় বনোওয়ারী লাল গোস্বামী (শান্তিপুরের জয় গোপাল গোস্বামীর পুত্র) "খিচুরী" নামক এক ব্যঙ্গ-কাব্য প্রচার করেন, তিনি এই পুস্তকে বঙ্গের তৎকালীন লেখকদের লইয়া আচ্ছা মজা করিয়াছিলেন, সে সময়ে বইখানির বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এই পুস্তকে তাঁহার ব্যঙ্গের তালিকায় আমিও পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার চোখ দুটি কি জানি কেন তার ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু আমার দাশরথী রায়ের

সমালোচনা বোধহয় তাঁর মোটেই ভাল লাগেনাই। তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছিলেন, তার দুটিছত্র মনে আছে :—

"চক্ষু দুটি পটল চেরা প্রতিভাতে আঁকা।
বল্লে পরে রাগ করিবেন, পথ ধরেছেন বাঁকা॥

অরুণের জর লইয়া রাত্রি জাগরণ ও সেবা শুশ্রূষা এবং আরও কয়েকটি কারণে আমি আবার শয্যাশায়ী হইলাম ; একটি কারণ,আমি গাড়ী করিয়া একজনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম ; ফলে গাড়ীর ঝাঁকুনীতে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইল। দিনরাত্রি মাথায় বরফ দিয়া রাখিতাম। তারপর তিনমাস এমন ছিলাম যে এ ঘর হইতে ও ঘরে যাইবার আমার সাধ্য ছিল না। এই সময় ভ্রাতা হেমচন্দ্র ছায়ার ন্যায় আমার কাছে কাছে ছিল, ও পাড়ার মাতঙ্গিনী পালিত নামক এক যুবক দয়া করিয়া আমার চিঠিপত্র গুলি লিখিয়া দিতেন।

১৮৯৮ সনে কলিকাতায় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। বোধ হয় আষাঢ় মাস, আমার সেই পরমা সুন্দরী মামাত ভগিনী সরোজিনী আমার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছিল, তাহার ও মাঝে মাঝে ফিট হইত ; ইহার মধ্যে আমার মামাত ভাই দৈবকী লালের (এখন নারায়ণ গঞ্জের মুন্সেফ) স্ত্রীর হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম হয়। বধু এমন সকল কথা কহিতে থাকেন যাহাতে অনেকের বিশ্বাস হয়,যে তাঁহার উপর প্রেতাশ্রয় হইয়াছে। এখানে অনেক ডাক্তারি চিকিৎসায় যখন কোন ফল হইল না, তখন মাতুল মহাশয়েরা নৈহাটী হইতে এক ভূতের ওঝা লইয়া এলেন। সে বড় সঙ্গিন ব্যক্তি, সে নানারূপ মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে যাহা বলিতে লাগিল, বধুটি তাহাতে একান্ত ভয়ের চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন এবং প্রেতের ভূমিকা অভিনয় করিয়া শেষে চলিয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বউ সত্যই ভাল হইয়া গেলেন।

তাসের ঘরের মত দুলিতেছিল, আশে পাশের মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমি দেখিলাম আমার স্ত্রী নাই, তখন হেমকে বলিলাম,"তিনি লজ্জাশীলা হইয়া হয়ত কোন ঘরে বসিয়া আছেন।" তখন সেই পতনোন্মুখ গৃহের মধ্যে প্রাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হেম ঢুকিয়া পড়িল এবং দ্বিতলের একটা ঘর হইতে হিড়হিড় করিয়া আমার স্ত্রীকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। বাড়ীখানি পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, মনে হইল কেউ যেন "তিষ্ঠ" বলিয়া কম্পিতা ধরিত্রীকে স্থির করিয়া ফেলিলেন।

পাড়ায় আমাকে সেদিন অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঐ ঘাষের উপর যে রমণী পড়িয়াছিলেন, উনি আপনার কে? আমাদের মনে হইল যেন একটা বিদ্যুৎ মাটিতে পড়িয়া আছে, এমন সুন্দরী বাঙ্গালীর ঘরে দেখা যায় না।" তাঁরা সরোজিনীকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এ কিছু নূতন নহে, তাহাকে দেখিয়া অনেকেই ইহার পূর্ব্বে চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইহার কিছু পরে কলিকাতায় প্লেগরোগের শুভাগমনের আশঙ্কায় সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শীঘ্রই 'কোয়ারেণ্টাইন' বসিবে, এই জনরবে কলিকাতা হইতে লোক পালাইতে সুরু করিল। তেমন ভয় কলিকাতায় কেহ আর দেখিয়াছেন কিনা, জানি না। ছেলে, বুড়ো, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে ভয়ে আড়ষ্ট, এরূপ সার্ব্বজনীন ভীতি কলিকাতার ন্যায় সহরে যে কি আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা লিখিয়া বুঝানো শক্ত। কলিকাতা হইতে শত শত সহস্র সহস্র লোক ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। কুম্ভমেলা বিশৃঙ্খল হইলে,সমুদ্র তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিলে.বোধ হয় সেই দৃশ্যের কতকটা কল্পনা করা যায়। রেল গাড়ীতে স্থানাভাব, পথের ভিঁড় ঠেলিয়া যাওয়া অসম্ভব; এক মহাজনতা যেন পথ না পাইয়া দুর্দ্দমণীয়

তাসের ঘরের মত দুলিতেছিল, আশে পাশের মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমি দেখিলাম আমার স্ত্রী নাই, তখন হেমকে বলিলাম,"তিনি লজ্জাশীলা হইয়া হয়ত কোন ঘরে বসিয়া আছেন।" তখন সেই পতনোন্মুখ গৃহের মধ্যে প্রাণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হেম ঢুকিয়া পড়িল এবং দ্বিতলের একটা ঘর হইতে হিড়হিড় করিয়া আমার স্ত্রীকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। বাড়ীখানি পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, মনে হইল কেউ যেন "তিষ্ঠ" বলিয়া কম্পিতা ধরিত্রীকে স্থির করিয়া ফেলিলেন।

পাড়ায় আমাকে সেদিন অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঐ ঘাসের উপর যে রমণী পড়িয়াছিলেন, উনি আপনার কে? আমাদের মনে হইল যেন একটা বিদ্যুৎ মাটিতে পড়িয়া আছে, এমন সুন্দরী বাঙ্গালীর ঘরে দেখা যায় না।" তাঁরা সরোজিনীকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এ কিছু নূতন নহে, তাহাকে দেখিয়া অনেকেই ইহার পূর্ব্বে চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইহার কিছু পরে কলিকাতায় প্লেগরোগের শুভাগমনের আশঙ্কায় সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শীঘ্রই 'কোয়ারেণ্টাইন' বসিবে, এই জনরবে কলিকাতা হইতে লোক পালাইতে সুরু করিল। তেমন ভয় কলিকাতায় কেহ আর দেখিয়াছেন কিনা, জানি না। ছেলে, বুড়ো, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে ভয়ে আড়ষ্ট, এরূপ সার্ব্বজনীন ভীতি কলিকাতার ন্যায় সহরে যে কি আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা লিখিয়া বুঝানো শক্ত। কলিকাতা হইতে শত শত সহস্র সহস্র লোক ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। কুন্তমেলা বিশৃঙ্খল হইলে,সমুদ্র তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিলে.বোধ হয় সেই দৃশ্যের কতকটা কল্পনা করা যায়। রেল গাড়ীতে স্থানাভাব, পথের ভিঁড় ঠেলিয়া যাওয়া অসম্ভব; এক মহাজনতা যেন পথ না পাইয়া দুর্দ্দমণীয়

বেগে ছুটিতেছে, যেন কোন রাজরাজেশ্বরের অক্ষৌহিণী সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতেছে।

(১৮)

ফরিদপুরে

আমি অশক্ত, আমি কোথায় যাইব ? কে লইয়া যাইবে ? মাতুলেরা চলিলেন, তাঁহারা বলিলেন "তুমি হেমকে লইয়া ষ্টেসনে যেও।" ইহার মধ্যে অরুণের উরু দেশের উর্দ্ধমূলে সন্ধি একটু ফুলিয়া বেদনা হইল, তাহার বয়স তখন ছয়। আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, অবশেষে দেখিলাম, সে একটা তক্তাপোশের নীচে পালাইয়া আছে। প্লেগ মনে করিয়া পাছে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, ছয় বৎসরের ছেলের প্রাণে সেই আতঙ্ক হইয়াছে।

এই অবস্থায় হেম আমাদিগকে লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর ভিঁড়ে মাতুলেরা কোন রকমে জিনিষপত্র তোলাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, কিন্তু আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যখন বাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন তাঁহারা একজন বাজার-সরকারকে রাখিয়া গেলেন, আমাকে পরের ট্রেনে লইয়া আসিতে। আমি বিপদ সমুদ্রে পড়িলাম। কোথায় যাইব ? কে লইয়া যাইবে ? সেই সরকারের আমার পরিবার সহ আমাকে লইয়া যাইবার মত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রকারিতা ও শক্তি কিছুই ছিল না, সে একটা মুটের মত ছিল। শেয়ালদা ষ্টেশনে পড়িয়া মনে হইল আমি বৈতরণীর পাড়ে আসিয়াছি, সম্মুখে যমরাজের বাড়ী।

সুয়াপুরের ঘরগুলি সমস্তই পড়িয়া গিয়াছিল—সেখানে পাকা ঘর তুলিবার সঙ্কল্পে খড়ো-ঘরগুলি মেরামত না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলাম। মামারা হয়তঃ আমার পীড়া অসাধ্য জানিয়া আমাকে ভয়ে ত্যাগ করিয়া গেলেন। দেখিলাম মাথার উপর নীলবর্ণ ছাদ—তাহা আকাশ, সেখানে শত শত নক্ষত্র, সেইগুলিই আমার আলো। আমার এই মুক্তাকাশ নিয়ে স্থান—আর কোথায়ও কোন সম্বন্ধ নাই। হেম

এমন সময় বিদায় লইতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। আমি কোন কথা বলিলাম না, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সে বলিল, "তুমি কেঁদ না—আমি তোমাকে ফেলিয়া কোথায়ও যাব না। আমার পরিবারেরা কলিকাতায় আছেন, আমার এখুনি যাওয়ার কথা—এই ঘোর আশঙ্কার সময় আমি ফিরিয়া না গেলে তাঁহারা যে অবস্থায় রাত কাটাইবেন, তাহা বুঝিতে পার, আমি মনে করিয়াছিলাম তোমাকে এখানে পৌঁছিয়া দিয়া রাত বারটার গাড়ীতে তাদের লইয়া যাইব। কিন্তু তোমাকে মামারা যে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে ফেলিয়া যাইবেন এ তো জানা ছিল না. তোমাকে আমি গোয়ালন্দ পৌঁছিয়া দিয়া ফরিদপুরের ষ্টীমারে রওনা করিয়া দিয়া ফিরিব—সেইখান থেকে সরকারমহাশয় তোমাকে লইয়া যাইবেন, আমি ফরিদপুর তারা-কুমার বাবুকে আজ রাত্রেই তার করিয়া দিব, ষ্টীমার ঘাটে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতে।" আমি বলিলাম, "দাদার পরিবার, তোর পরিবার—এই দুইদিনে যে কলিকাতায় ভয়ে মরিয়া যাইবে।" সে বলিল "তার ঠিক তোমার মত নিরুপায় নয়--লোকজন বাড়ীতে আছে—কিন্তু না হ'লেই বা কি? আমি কোন্ প্রাণে তোমাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাব? যখন সম্মুখে কর্ত্তব্য এরূপ ভাবে উপস্থিত হয়, তখন সেটাকে দুর্ভাবনা ভেবে কখনই অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে।"

হেম অতিশয় নম্র প্রকৃতির লোক, এমন মিষ্টস্বভাবের লোক বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার মত সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও বীরোচিত কার্য্য কলাপও আমি খুব কম দেখিয়াছি। অপগণ্ড শিশু যেরূপ মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়, আমি সেইভাবে তাঁহার পরিচালনায় উপর নিঃসহায় ভাবে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া নাম জপ করিতে লাগিয়া গেলাম।

গোয়ালন্দ যাইয়া প্রাতে হেম আমাকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিল, সঙ্গে স্ত্রী পুত্রাদি ও সরকার মহাশয়। হেম বিদায় কালে অশ্রু রুদ্ধকণ্ঠে আমাকে সাহস দিয়া গেল। আমার সহোদর ভাই নাই, কিন্তু হেমের অপেক্ষা কোন্ সহোদর বেশী স্নেহশীল হইতে পারিত?

পদ্মায় দেড়বৎসর পূর্ব্বে একবার ভাসিয়াছিলাম, আবার সেই পদ্মায়। রোগ সারিবার যে কোন উপক্রম হইয়াছে, তাহা তো বোধ হইল না। ফরিদপুর আমার ভগিনীপতি তারাকুমার রায় সবজজের সেরেস্তাদার, ৫৮৲ টাকা বেতন পান। তাঁহার পুত্র কন্যা ও জামতা প্রভৃতিতে সংসারটি নিতান্ত ছোট নহে। ঐ অল্প বেতনে অনেক কায়ক্লেশে চলে, এই ভগিনী আর আমি যমজ। আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের একটু ভয় হওয়া খুব স্বাভাবিক, যেহেতু তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমি বহুদিন রোগে ভুগিতেছি, ডাক্তাররা বলিয়াছেন 'রোগ সারিবে না', অথচ পুত্র কন্যায় আমার সংসারটিও নিতান্ত ছোট নহে, আমি একবারে নিঃস্ব। তাহাদের ভয়ের আভাষ বুঝিয়া আমি তারাকুমার বাবুকে পাঁচশত কয়েক টাকা দিলাম। পুস্তক বিক্রয়লব্ধ টাকার সেই অংশ অবশিষ্ট ছিল। টাকা পাইয়া তারাকুমার বাবুর ভয় দূর হইল। তিনি খুব আদর দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ছোট বাড়ীতে আমাদের সঙ্কুলান হইবে না, এবং তিনি আমাদিগকে একটা ভার বোধ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় স্থানান্তরে যাইবার কল্পনা করিয়া ছিলাম। মাতুলদিগকে চিঠি লিখিয়া এই দুঃসময়ে জবাব পাইলাম না। আর একজন আত্মীয়কে চিঠি লিখিয়া ছিলাম, তিনি নানা ওজুহাতে আমাকে এড়াইলেন। কিন্তু কবি দীনেশ চরণ বসু মহাশয়কে বিপদে পড়িয়া (তিনি কায়স্থ হইলেও) আশ্রয় প্রার্থনা পূর্ব্বক চিঠি লিখিয়া-

ছিলাম, তাহার উত্তরটি আমি এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছি—তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বহু দিনের পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হওয়া দূরে থাক তোমার পীড়ার এখন আরোগ্য হয় নাই জানিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া যে এই পত্র খানি লিখিয়াছ, তজ্জন্য যে কত দূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার এখানে তুমি সপরিবারে যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পার, তাহাতে আমার অপার আনন্দ ভিন্ন কোন প্রকারের অসুবিধা হইবে না। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে হইলে তোমাকে অধিকতর সুবিধা দিতে পারিতাম। তথাচ এইক্ষুদ্র গৃহের বর্ত্তমান অবস্থায় আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে তাহার ত্রুটি হইবে না। তুমি যত শীঘ্র পার সপরিবারে রওনা হইয়া আসিবে। ষ্টিমারে আসিলে এলাচিপুরের টিকিট কাটিবে। পূর্ব্বে জানিতে পারিলে (আরচা) ষ্টেসনে পাল্কী ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখা যাইতে পারে। চাকরাণী পাওয়া কঠিন। শূদ্র চাকর একজন একরূপ সুস্থির করিয়া রাখিলাম। মনে কোন রূপ ভিন্ন ভাব না ভাবিয়া অন্ত কাহারও কথায় কথায় কর্ণপাত না করিয়া সরল স্নেহের আবেগে যেরূপ পত্র লিখিয়াছ, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে আসিবে, এবং আমাদিগকে সুখী করিবে।

যাহা হউক, তারাকুমার বাবু যখন তথায়ই থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন দীনেশ বসু মহাশয়ের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু চিঠির উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম; তিনি তাগিদ দিয়া আর একখানি স্নিগ্ধ পত্র লিখিলেন, সেই পত্রের উত্তর দিতে যাইব, এমন সময় তাঁহার স্ত্রীর পত্র পাইলাম, তিনি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন। দীনেশ বাবুর বয়স ৪০এর কিছু উপরে হইয়াছিল—শরীর খুব ভাল ছিল। তিনি 'জুরি' হইয়া ঢাকায় চলিয়া-

ছিলেন, পথে রাত্রে নৌকায় কলেরা হয়। যেদিন প্রাতে স্বস্থদেহে প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিলেন —তার পরদিন বেলা তিন-টার সময় মাঝি তাহার মৃত দেহ লইয়া বাড়ীতে আসিল, সে বোধ হয় ১৮৯৮ সনের আষাঢ় মাসে।

এই অভাবনীয় সংবাদে যে আমি কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা লিখিতে পারি না। আমার তিন চার রাত্রি ঘুম হয় নাই, এবং তাঁহার মুখ মনে পড়িলেই ফিট হইত। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার জন্য অল্পতেই আমি একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িতাম।

ফরিদপুর আসিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আদর স্নেহ লাভ করিলাম। তখন শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া নানাস্থানে চিঠি লিখিয়া আমার সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর এক জন আমার পূর্ব্ব সুহৃদ বরদা চরণ মিত্র মহাশয়। আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম, অতি কষ্টে কখনও কখনও একটু হাঁটিয়া প্রতিবাসী অনাথবন্ধু কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া বসিয়া সেতার বাজাইতাম, কখনও বা দিগম্বর সান্ন্যাল মহাশয়ের এবং অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয় গল্প করিতাম। ইঁহাদের বাড়ী আমাদের বাসা হইতে ২।১ মিনিটের পথ দূরে ছিল। বরদা চরণ মিত্র ছিলেন তখন ফরিদপুরের বাধা জজ, তিনি প্রায়ই আমাকে দেখিতে সেই পর্ণ কুটিরে আসিয়া প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতেন। এতাদৃশ ব্যক্তি আমাকে দেখিতে আসাতে সহরে আমার নাম এরূপ প্রচার হইয়া গেল যে বহু সম্ভ্রান্ত উকিল, ডিপুটী, জমিদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বরদা মিত্র মহাশয় দে সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সাহিত্যিক পেন্সনের জন্য গভর্ণমেণ্টে আরজি করিবার জন্য অনেকে উপদেশ দিলেন। তখন গ্রিয়ারসন সাহেব ভাষাতত্ব

অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি শিমলায় থাকিতেন। তিনি 'বঙ্গভাষা সাহিত্য' পড়িয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন; তিনি লিখিলেন—"আপনি যদি বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, তবে আমি সমর্থন করিব।" এই চিঠি দেখিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে এবং মিত্র মহোদয় খুব জোর পাইলেন, এবং আমার আবেদন পত্রের উপর অনুকূল মন্তব্য লিখিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। তার পর কমিসনর স্যাভেজ, সাহেব ফরিদপুর পরিদর্শন করিতে আসিলে আমি উঁহাদের উপদেশ মত পাল্কীতে চড়িয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলাম, দেখিলাম তিনি নাম (savage) দিয়া ভীতি উৎপাদন করিলেও অতি মৃদু ও দয়ালু স্বভাব। আমার অবস্থা জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আবেদন পত্র সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন। এই ভাবে সরকার হইতে আমার ২৫৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর হইয়া আসিল ১৮৯৯ সনে। মঞ্জুরী হইবার সংবাদটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাকে জানাইয়াছিলেন। সাহিত্যিক বৃত্তি বঙ্গদেশে এই প্রথম। তার পর কবিবর হেমচন্দ্র পাইয়াছিলেন, তাহাও সেই ২৫৲ টাকা।

মিত্র মহাশয়কে আমি বলিলাম "আমার কন্যা যখন ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা হইল, ইহার বিবাহের উপায় কি?" তখনও বিবাহের বাজারে বরের দর এতটা চড়িয়া উঠে নাই। আমরা কুলীন, অকুলীনদের আমাদের উপর তখনও একটা নেশা ছিল, সুতরাং পৈত্রিক রক্তের গুণে তখনও একটু নীচে নামিলে বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হইত না। যাহা হউক কন্যা বিবাহ তখনও একটা ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। মিত্র মহাশয় তাহার কোর্টের উকিল দিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "দীনেশবাবু City of Glasgow, লাইফ এসিয়রেন্স কোম্পাণির এজেণ্ট, আপনারা প্রত্যেকে একটা বীমা করুন।" তিনি নিজে বার হাজার টাকার বীমা

করিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে অনেক উকিল, ডিপুটি ও মুন্সেফ বীমা করিলেন। আমার ইহাঁদিগকে লইয়া ডাক্তার সাহেবের ওখানে অনেক সময় যাইতে হয় নাই, মিত্র মহাশয় ডাক্তার সাহেবকে দিয়া আমার কাজ যতটা লঘু হওয়ার সম্ভব তাহা করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি দুইমাসের মধ্যে এই বীমার কাজে এগার শত টাকা পাইয়াছিলাম। কন্যা-বিবাহ ফরিদপুর বল্লভদি গ্রামে ঠিক হইয়া গেল। বর কুলদাকুমার সেনরায় মাইনর পরীক্ষায় ঢাকা ডিভিসনে প্রথম হইয়া পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় মাদারীপুর স্কুল হইতে দশটাক বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় এল, এ পড়িতেছিলেন। ইহাদের বাড়ীর অবস্থাও মোটামুটি মন্দ ছিল না। আমাকে অনেকটা নীচে নামিয়া এই সম্বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বিবাহের ঘটক ছিলেন বল্লভদি গ্রামের রাজেন্দ্র গুপ্ত। ইনি এখন মুন্সেফী করিতেছেন। বিবাহে ঠিক এগার শত টাকাই ব্যয় হইল।

এই সময়ে রমণী মোহন ঘোষ নামক এক তরুণ বয়স্ক উকিল, আমার নিকটে সর্ব্বদা আসিতেন। তিনি খুব ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন, রবি বাবুর প্রায় সমস্ত কবিতা তার মুখস্থ ছিল; তাঁহার নিজের ভাষায় ও রবি-বীণার একটা ঝংকার মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিত, কিন্তু নিভৃত পল্লীর সিউলী ফুলের গন্ধ, কেঁয়ার সুবাস, ও পল্লী বালিকাদের স্নেহার্দ্র হৃদয়ের পবিত্রতা লইয়া যখন রমণী কবিতা লিখিতেন, তখন তাহার নিজস্ব একটা রাগিণী ফুটিয়া উঠিত,—সেটা আমার কাছে এত মনোহর লাগিত, যে মনে হইতে যেন সমস্ত পল্লী-প্রাণের রস দিয়া তাহা কোমল-স্নিগ্ধ করা হইয়াছে। রমণীর চেহারাটা কতকটা নামের উপযোগী, গোঁপ না থাকিলে তাঁহাকে মেয়েলোক বলিয়া ভুল হইতে পারিত, এবং স্বরটিও ছিল মেয়েলী ধরণের, ঈদৃশ ব্যক্তি যে ওকালতিতে পশার জমাইতে পারি-

289



মতিলাল চক্রবর্ত্তী।

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে)

বেন না, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়ার কথা নহে। অথচ রমণী এরূপ দ্রুত ইংরেজী ও বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন, যে তাঁহার অসামান্য মনস্বীতা কাহারও অগোচর ছিল না। আমি নিজ হাতে লিখিতে পারিতাম না, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রবৃদ্ধ আকারে বাহির করিব, এই ছিল আমার লক্ষ্য। উপেন্দ্র নামক এক যুবক এবং রমণীকে দিয়া আমি যে কত লেখা লিখাইয়াছি,তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ একরূপ অপরিশোধনীয়। আমি প্রায়ই মিত্রমহাশয়কে রমণীর কথা বলিতাম, তিনি রমণীর কবিতা পড়িয়া যেরূপ সুখী হইতেন, তাঁহার ওকালতির বিড়ম্বনা শুনিয়া তেমনই দুঃখিত হইতেন। তিনি রমণীকে একটা কমিশন দেন, তাহাতে সে ৬০০ শত টাকা উপার্জ্জন করে। রমণী মোহন ঘোষ এখন সাহিত্যিক জগতে সুপরিচিত কবি এবং বোম্বের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল। এত বড় পদ পাইয়াও রমণী যেমন তেমনই আছেন, সেই মেয়েলী ঢঙ্গের মধুর কল-হাসি, মৃদু-কথা, বন্ধুবর্গের সহিত প্রাণ-জড়াণো ভাবে মেলা-মিশা।

কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকীল দিগম্বর সান্ন্যাল সম্বন্ধে আমি 'প্রদীপে' দীর্ঘ জীবনী লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার 'সুকথা' নামক পুস্তকে পুনবার মুদ্রিত হইয়াছে। কোন জেলা কোর্টের উকীল তাঁহার মত ৩।৪ হাজার টাকা মাস উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। তিনি ছিলেন উকিল শিরোমণি—সাধু শিরোমণি, বিনয়ের খনি, শুচিতার আদর্শ। জঙ্গল ও কাঁটা বনে ত পৃথিবী আচ্ছন্ন, ইহার মধ্যে যেমন একটা বনমল্লিকা বা যুথিকা ফুটিয়া প্রমাণ করে,—পৃথিবীর সবই কাঁটা নহে,—এখানেও শোভা সুগন্ধ আছে—আদালতের নানাছল, অভিসন্ধি ও কুটিলতার ভিতর তেমনই কেমন করিয়া দিগম্বর বাবু উদিত হইয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন—এখানে সকলই ছল চাতুরী নহে, এ জায়গাটাও ভগবান

একবারে ভুলিয় যান নাই। দিগম্বর বাবুর চেহারা অনেকটা স্যার গুরুদাসের মত ছিল, তিনি নিজেও একথা বলিয়াছেন, যে বহুলোকে তাঁহাদের এই সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিতেন। দিগম্বর বাবু আমাকে ছেলের মত ভালবাসিতেন,—নিজে কাছে বসিয়া আমাকে খাওয়াইতেন, তাঁহারও হঠাৎ মৃত্যু আমাকে অভিভূত করিয় ছিল। এই ক্ষুদ্রাকৃতি, অতি নম্রপ্রকৃতি, বিনয়ী অথচ তেজস্বী উকিল যখন কুমিল্লা আদালতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, তখন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন কংগ্রেশ-বিশ্রুত দেশমান্য অম্বিকা মজুমদার—শাল প্রাংশু মহাভুজ দীর্ঘাকৃতি—এই মহাশয়ের অদ্বৈতাচার্য্যের মতই "পক্ক কেশ পক্ক দাড়ি বড় যোগ্নিীয়। দাড়ি পড়িয়াছে, তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া।"

অম্বিকা বাবুর ধর্ম্মমত, প্রায় নাস্তিক বাদের কাছা-কাছি, মিলের মতন তিনি নীতি শাস্ত্রটাকেই চরম মনে করিতেন, আমার সঙ্গে তাঁহার এই লইয়া তর্ক-যুদ্ধ চলিত। তিনি বক্তৃতার রাজা, রাজনৈতিক আন্দোলনের পাণ্ডা, দেশ-উদ্বোধন-মন্দিরের অন্যতম প্রবীন পুরোহিত। কিন্তু রাজনীতি আমাকে কখনও আকর্ষণ করে নাই, বিশেষ আমি একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া দিন কাটাইতাম, সুতরাং তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতা শোনা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু মিত্র মহাশয় কিংবা দে সাহেব (ঠিক মনে পড়িল না) যখন ফরিদপুর ছাড়িয়া যান, তখন সেই বিদায়-সভায় আমি বহু কষ্টে উপস্থিত হইয়াছিলাম, অম্বিকা বাবু সেদিন মাত্র দুএক মিনিট বাঙ্গলা-ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই দুই এক মিনিটেই তিনি শ্রোতৃবর্গের মন হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, অন্ততঃ আমার। তিনি একটি ফুলের মালা লইয়া বিদায়োন্মুখ মহোদয়কে পরাইয়া দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, "আমরা আপনাকে আর কি দিব? কিন্তু এই যাহা দিতেছি, ইহার মত উৎকৃষ্ট পৃথিবীতে কিছু নাই, এই ফুলের মালাই সর্ব্বোত্তোভাবে আপনার যোগ্য।"

ফরিদপুরের আইন-আকাশের অপরাপর জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমার তাৎকালিক বন্ধু পূর্ণ মৈত্রেয় ও মথুর মৈত্রের উল্লেখযোগ্য, ইঁহারা এখন সেখানকার বড় উকিল। ঢাকায় নবগ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া বহুদিন যাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম, সেই কৈলাসচন্দ্র দাস তখন কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এখন তাঁহার প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি উকীল-সরকার। সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফরিদপুর-বার ছাড়িয়া দিয়া হাইকোর্টে আসিয়াছেন, তিনি তখন বাঙ্গলায় অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন, সুতরাং ওকালতি জমাইতে পারেন নাই। এখানে তিনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর শ্যামবাজার ট্রামের আড্ডার নিকট বাড় করিয়াছেন। একদিন দেখিলাম, তিনি একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে লইয়া ট্রামে যাইতেছেন, আমি সেই ট্রামের আরোহী ছিলাম। মেয়েটির মুখে চোখে লাবণ্য ঢল ঢল, তাহার বয়স ৭।৮, আমি বলিলাম "এটি বুঝি মেয়ে?" সতীশ বাবু হাসিয়া গোপনে বলিলেন, "এ মেয়েটির বাপ মা কেউ নাই, আমার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই, তবে ইহাঁর বাপ-মা মরিবার সময় ইহাকে লালন-পালনের ভার আমাকে দিয়া গিয়াছেন,— মেয়েট জানে আমি ইহার পিতা, আগাছাটি এরূপ ভাবে জুড়িয়া গেছে, যে আমাদের সংসারের পক্ষে একে এড়ানো আর সম্ভবপর হইবে না।" দেখিলাম মেয়েটি সহসা সতীশ বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া হীরেন্দ্র বাবুদের বাড়ীর পুতুল গুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবা এটা কাদের বাড়ী," আমি দেখিলাম মেয়েই হইয়া গেছে বটে। ইহার পাঁচ সাত বৎসরের পরে দেখিলাম, সতীশ বাবুর বাড়ীতেই মেয়েটী অন্দরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাথায় ঘোম্‌টা নাই, কপালের সিন্দুর বিন্দু স্পর্শ করিয়া শাড়ীর একটা পাড় রহিয়াছে। সতীশ বাবুকে বলিলাম, ইহার বিবাহ কোথায় দিয়াছেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে।"

ভাদ্রমাসে আমার পীড়া বড়ই বাড়িয়া গেল। আবার বিছানায় পড়িয়া রহিলাম; এই সময়ে একটা সাপ আমার শোবার ঘরের দাওয়ার কাছে কিলবিল করিয়া বৃষ্টিতে চলিয়া গেল, কেন জানি না। আমার মন সাপের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। তার পরদিন খড়ো ঘরের চালে আর একটা সাপ দেখিলাম, সেটা আমার বিছানার দিকে চাহিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। এই ভয় আমাকে এতদূর পাইয়া বসিল যে আমি সর্ব্বত্র সাপ দেখিতে লাগিলাম, বাহিরে ত এই দুটি মাত্র সাপ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু মনের ভিতরে অসংখ্য সাপ আনাগোনা করিতে লাগিল। মশারির দড়িটা সাপ হইয়া দুলিতে লাগিল, চটিপায়ে দিতে মনে হইল যেন উহার মধ্যে পা ঢুকাইলেই পা খাইয়া সাপে ঠেকিবে, পায়ে ঠাণ্ডা জল লাগিলে মনে হইতে লাগিল, সাপে পাখানি জড়াইয়া ধরিয়াছে। সেই দিন দৈব ক্রমে আর দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার সর্পভীতি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। দুপ্রহরে একটি ভদ্রলোক আসিয়া আমার কাছে অনেক সাপের কেচ্ছা বর্ণনা করিয়া গেলেন, আমি যে সাপের ভয়ে ভীত তাহা কাহাকেও বলি নাই। তাঁর প্রত্যেক কথায় আমার যে ভয় হইতেছিল—তাহা আমার বুঝাইবার শক্তি নাই। আমার মনে হইল যেন তাঁহার বর্ণিত প্রত্যেকটি সাপ ফনা দোলাইয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া আছে এবং আমার আত্মাপুরুষ তাহাদের ভয়ে কম্পিত হইতেছে। তিনি চলিয়া গেলে বেদেরা "সাপের খেলা "দেখবে গো" চীৎকার করিয়া ঝালি মাথায় আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়া চলিয়া গেল। কিরণ আসিয়া আমাকে ধরিল "বাবা, সাপের খেলা দেখবো" আমি তাকে এমন ধমক্ দিয়াছিলাম যে সে ভয়ে আতকে উঠেছিল। আমার স্ত্রী বলিলেন "ওরা শিশু, সাপের খেলা দেখতে চেয়েছে, কি অন্যায়টা করেছে? তাতে তুমি এমন চীৎকার কচ্চ, যেন

কি একটা ভয়ানক কাণ্ড করেছে।" আমি লজ্জিত হইলাম, কিন্তু আমার অন্তর্যামী জানেন, চীৎকার আমি করি নাই, আমাকে ভয়ের যে দেবতা পাইয়া বসিয়াছিল, এ তারই চীৎকার।

কয়েক রাত্রি চোখ বুজিতে পারি নাই, যতবার চোখ বুজিতে চেষ্টা করিয়াছি, মনে হইয়াছে পায়ের কাছে সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে, চোখ বুজিলেই কামড়াইবে। উপেন্দ্রবাবু আসিয়া 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য কাপি লিখিতে লাগিলেন, একটা লাল কালীর দোত থেকে কালী তুলিতেছিলেন, আমার মনে হইল সেগুলি সাপের রক্ত। শুধু মনে হওয়া নয়, এক একটি অক্ষর লাল কালীতে লিখিতেছিলেন আর আমার পঞ্চপ্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছিল। এর পর লোকের চোখের কোণে একটু রক্তিমা থাকিলে ভয় হইত, মনে হইত যেন উহা সর্প-চক্ষু।

আমি যে কি উৎকট যন্ত্রনায় ছিলাম তা বলিতে পারি না, এদিকে হাঁটিবার শক্তি একবারে লোপ পাইল। এই সাপের ভয়ের কথা কাউকে বলিলাম না—তা হ'লেই তো সকলে হাতে তালি দিয়া বলিবে "ক্ষেপিয়া গেছে।" জপ করিতে চেষ্টা পাইতাম, কিন্তু হরিনাম ছাপাইয়া গোখরার চোখ দুটি আমার মন অধিকার করিয়া বসিত। মুখে হরিনাম আসিত না!

এই উৎকট যন্ত্রণা প্রায় ১৫ দিন ছিল; শেষে তাহা এরূপ অসহ্য হইয়াছিল যে আমি প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতাম "আমি চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিতেছি না—তুমি আমাকে মারিয়া ফেল—এরূপ মৃত্যু যন্ত্রণা দিও না"। একদিন সন্ধ্যার পর ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। পা ধুইয়া ছিলাম, মনে হইল যেন এ[illegible] বরফের মত ঠাণ্ডা, কালীর মত কালো সাপ আমার পা-দুটি জ[illegible] আছে, বুকের ভিতর অসহ্য কষ্ট হইতেছে। "আমার কে [illegible]

আছ—আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে চোখ দুটি বুজিয়া আসিল, নিঃস্বসহায়ের—নিরালম্বের—একান্ত বিপন্নের নির্ভরের অশ্রু চোখের কোলে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিল, তখন কে যেন আমাকে ডাকিল, সে স্বর আমার এখনও মনে আছে,—তাহা কঠোর হইয়াও কোমল, ক্রুদ্ধ হইয়াও স্নেহার্দ্র, বাহিরের হইয়া একান্ত আপনার জনের মত। স্পষ্ট শুনিলাম "তুই মনসাদেবীকে গালাগালি করেছিস্; জানিস না যারা কুঁড়ে ঘরে থেকে সাপের ভয়ে অস্থির হয়, তারা ভয়ে 'মা'মা' বলে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া মনসা দেবীর শরণ নেয়, যে পাদ পীঠ শত শত ভক্তের অশ্রুতে সিক্ত, শত শত লোক যে মঙ্গল-ঘটে অর্ঘ্য দিয়া শান্তি পায়, তুই স্পর্দ্ধা ও হঠকারিতার সহিত তাহাকে ব্যঙ্গ করেছিস্, লোকের প্রাণ যেখানে আর্ত্ত হইয়া, অসহ্য কষ্ট পাইয়া, ফুল বিল্বদল লইয়া একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তীর্থযাত্রী হয়, তখনকার তাদের শুচিতা, ভক্তি ও বিশ্বাস তুই দেখ্‌লি না,—সেইখানে বুট জুতা পায়ে হটকারিতার সহ পূজার ফুল মাড়াইয়া এলি।" ঠিক এই কথা গুলি না হতে পারে, কিন্তু এ ভাবের কথা। সেই তীব্র ভৎর্সনার সুরেও মনে ভক্তি হইল। জাগিয়া দেখিলাম কেউ নাই, কেবল আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে ও মুখে অলক্ষিত ভাবে 'মা 'মা' ডাক উচ্চারিত হইতেছে, এবং আমার মুক্ত জানেলার পথে সদ্যপ্রস্ফুট শিউলী ফুলের ঘ্রাণে দিক আমোদিত করিতেছে, মনে হইল, যিনি আসিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই অঙ্গ-গন্ধ।

জাগিয়া অশ্রু কম্পিত কণ্ঠে আমার মেয়ে মাখনকে বলিলাম, একটা [illegible] বাতি আনিতে, ও আমার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বইখানি দিতে। [illegible] যেখানে যেখানে মনসা দেবীর নিন্দা করিয়াছিলাম, অপরাপর ঠাকুর [illegible]র নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত কাটিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম

মনসাদেবীকে লইয়া আমি কত বিদ্রূপই না করিয়াছিলাম। "তাঁহার মত দুষ্ট মেয়ে দেবলোকে নাই" "কাণার গীত এক কাণী প্রথম রচনা করেন" ইত্যাদি প্রকারের ব্যঙ্গোক্তিই করিয়াছিলাম। চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে গুলি কাটিয়া ফেলিলাম। আমার মাস্তিষ্কের বিকৃতি-জাত সেই সর্পজগৎ হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল, তার পর দিনও একটু ভয় ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলাম। সেই দিনে একটি টাকা মনসা দেবীর মানৎ করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ আমি 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সংখ্যা উপাসনা কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; যদি পাইতাম, তবে এইখানে সেটি উদ্ধৃত করিয়া দিতাম—নূতন করিয়া লিখিতাম না। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি কলিকাতায় এক ছোট বাসায় ছাদের উপর শুইয়াছিলাম, আমার স্ত্রী আমার পাশেই শুইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় দেড় টার সময় একটা ভয়ানক শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম,তখন জ্যোৎস্না ছাদের উপর আলো ছড়াইয়া দিয়াছে—দেখিলাম, একটা কৃষ্ণ সর্প আমার গা ঘেঁষিয়া ঘনিষ্টতা করিতে চেষ্টা পাইতেছে, আমার স্ত্রীকে জাগাইলাম। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বুঝি সাপে আমাকে কামড়াইয়াছে, কিন্তু সাপ আমায় কমেড়ায় নাই। অথচ এ সময়ও আমার কোন ভয়ই হইল না, হাতে তালি দিয়া সাপ তাড়াইয়া দিলাম। যদি ঐ ঘটনাটি আমার সেই সময়ে হইত, তা হলে বোধ হয় ভয়েই মরিয়া যাইতাম। ইহার দেড় বৎসর পরে আমি 'বেহুলা' বই লিখিয়াছিলাম, ৩।৪ বছরের মধ্যে তাহার ২০।২২ হাজার কপি কাটিয়া গিয়াছিল,। আমার মন এই পুস্তক লব্ধ অর্থ মনসাদেবীর দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, একথা বলিলে যাহারা আমাকে উপহাস করিবেন,—তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া নাই। আমার বন্ধু বৃদ্ধ

ঐতিহাসিক বেভারেজ সাহেব লিখিয়াছিলেন, মনসাদেবীর পূজা মানসিক দুর্ব্বলতা, হয়ত তাহাই। কিন্তু যাহা আমাকে বল দিয়াছিল, রোগের সময় উৎকট অমৃততুল্য ভেষজের কার্য্য করিয়াছিল, আমি কখনই তৎসম্বন্ধে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করিব না। যিনি যে ভাবেই আসুন না কেন, তিনি পরম অনুকম্পা করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি ভগবানের প্রকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

এই ভাদ্র মাসেই আমি ভগবানের দত্ত আর একটি মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলাম—তাহা বিনয়ের ন্যায় পুত্র লাভ। জীবনের সমস্ত সৌভাগ্যের মধ্যে যে সৌভাগ্য পূর্ণ শ্রীভূষিত হইয়া আমার জীবন অমৃতময় করিয়াছে—তাহা বিনয়রূপে প্রকাশ ভগবৎদয়া।

এ পর্য্যন্ত কবিরাজ বিজয়বাবু সপ্তাহে সপ্তাহে আমাকে তৈল ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছিলেন। পীড়ার উপশম হউক আর না হউক, আমি তাহা ব্যবহার করিতেছিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে যোগীন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং সেই সূত্রে ফরিদপুর যাতায়াত করিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, ইনি বিদ্যা বুদ্ধি, খ্যাতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের যোগ্য পুত্র। আমাদের অল্প সময়ের সাক্ষাৎকারেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হইল, সে অনুরাগের ফল জীবন-ব্যাপী বান্ধবতা ও ভ্রাতৃ-ভাব। ইহা কথার কথা নহে, বোধ হয় খুব কম ভ্রাতাই ভ্রাতার জন্য এত করে, যোগীন্দ্র কবিরাজ আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, খুব কম বন্ধুই এরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বন্ধুর হিতে রত থাকেন। ফরিদপুর থাকার সময় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি "উড়িষ্যার চিত্র" লিখিতেছিলেন। ডিপুটি শ্রেণীতে শ্রীযুক্ত

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সিংহ এই দুই জন তাঁহাদের ডিপুটি পদোচিত চির-বিশ্রুত শার্দ্দুলবিক্রমের নাম হাসাইয়াছেন। ইহারা নিতান্তই ভাল মানুষ। যতীন্দ্রবাবু অতি সাদাসিধে লোক, কিন্তু উড়িষ্যার চিত্র পড়িয়া বোঝা যায়,ইনি বিলক্ষণরূপ পরের টিকি নাড়া দিতে জানেন। ইনি গোঁড়া হিন্দু, অথচ ইহার রুবতারা পড়িয়া দেখা যায়, ইংরেজী উপন্যাসের নকলে ইনি বেশ বিলাতী প্রেম-সমুদ্রে ঢেউ তুলিতে জানেন। ইনি পূজা আহ্নিক লইয়া ব্যস্ত এবং হাঁচি ও টিকটিকির শব্দ ঋষিবাক্যের ন্যায় অমোঘ মনে করেন, অথচ এক খানি উপন্যাসে তিনি একটি চরিত্রকে পঞ্জিকার নিষিদ্ধ দিনে খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিয়া চলার দরুণ পরিহাস করিতে কসুর করেন নাই। যতীন্দ্র বাবুর বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝিবার উপায় নাই, প্রত্যুত লেখায় ও ব্যবহারে সামঞ্জস্য থাকা সর্ব্বদাই একটা অপরিহার্য্য নিয়ম নহে। যতীন্দ্র বাবুর পরিহাস-রসিকতার শক্তি বেশ তীব্র, তাঁহার লেখার ভঙ্গীটি চমৎকার, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম তাঁহার নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ সঙ্গ। বিশ্বেশ্বর বাবু ও যতীন্দ্রবাবু সাহিত্যিক গুণে আমাদিগকে যতটা মুগ্ধ করেন,তদপেক্ষা চরিত্র-গুণে বেশী প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া বিশুবাবুর মৌলিক গবেষণা শক্তিটি কম নহে। তিনি ময়নামতীর গান লইয়া রুস্তম মত মল্লযুদ্ধ করিতেছেন। এ বিষয়ে যে তিনি জয়ী হইবেন, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতায়।

১৯০০ সনের কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে আমি সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় শ্যাম-পুকুর ষ্ট্রীটে ১১৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় আমার জন্য এক খানি বাড়ী ঠিক করেন, উহার উপরে ৮×১০ ফিট এই মাপের দুই খানি ঘর ছিল, তৎসংলগ্ন একটী ছাদ ছিল এবং নীচে একখানি রান্না ঘর ও এক খানি বাহিরের ঘর ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত মাপের, নীচে বাড়ী-সংলগ্ন একটী সন্দেশের দোকান।

প্রথমবার কলিকাতায় যখন ছিলাম, তখন রোজ সন্ধ্যাবেলা নগেন-বাবু আমাকে দেখিতে আসিতেন, রোগের শয্যায় সান্ত্বনা দিতেন, অভাবে পড়িলে ভৃত্যাদি পাঠাইয়া সহায়তা করিতেন, এবারও তাই।

শ্যাম পুকুরের ঐ বাড়ীটায় আসা অবধি ছেলেরা সর্ব্বদা ব্যারামে ভুগিত। রোজ যোগীন্দ্র কবিরাজ মহাশয় দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল, ততই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। এদিকে এম, এ, পাশ, মেডিকেল কলেজে চার বছর পড়িয়াছেন,—কবিরাজী শাস্ত্রে তাঁহার এতটা অধিকার যে কোন রোগের লক্ষণ বলিলে তিনি চরক, সুশ্রুত কি বাগভট হইতে সেই লক্ষণ অনুযায়ী শ্লোক বলিতে থাকেন। সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রটি যেন নখাগ্রে, কিন্তু ইহাতে আমি তাঁহার প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়াছি বটে, আকৃষ্ট হই নাই; কিন্তু

যখন তিনি সমস্ত শকুন্তলা, সমস্ত উত্তররামচরিত মুখস্থ বলিতেন, প্রাকৃত ভষার কথোপকথন পর্য্যন্ত বাদ পড়িত না, স্বয়ং দেবী ভারতীর ন্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুকণ্ঠের ঝংকার সহিত শ্লোক বলিয়া যাইতেন, তখন বিস্ময় জন্মিত, বুঝিতাম বেদ কি করিয়া শুধু স্মৃতি-শক্তির বলে বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, ইনি প্রাচীন স্মার্ত্ত-শিরোমণিদেরই বংশধর। কোন দিন "ইথং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ। চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটিকুটিলাননৌ॥" হইতে সমস্ত চণ্ডী আওড়াইয়া যাইতেন, কখন ও "অবিদিত গত যামা" প্রভৃতি উত্তরচরিতের শ্লোক পড়িয়া অশ্রু-কণ্ঠ হইতেন, কারণ ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তিনি অনর্গল হিন্দী ও সংস্কৃতে বক্তৃতা করিতে পারেন, ইংরাজীতেও তাঁহার বাগ্মিতা প্রশংসনীয়। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ হইলাম। যে কোন কঠিন রোগ হইত, তিনি আমার ভয় দেখিলে হাসিয়া বলিতেন "কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ" আমার বড় মেয়ে একবার মরিবার মুখে পড়িয়া ইঁহার চিকিৎসায় বাঁচিয়া গেল। সেই বাড়ীতে আমার প্রত্যেক ছেলেই কোন না কোন উৎকট রোগে পড়িয়াছে, তিনি চিকিৎসা করিয়া সারাইয়াছেন এবং মাঝে মাঝে যেরূপ মেঘের পশ্চাতে এভারেষ্টের শৃঙ্গ দেখা যায়, তেমনি তাঁহাকে আগে পাঠাইয়া শৈল বিশাল-দেহ গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ উদিত হইতেন। ইঁহাদের দুইজনকে দেখিলেই আমাদের বাড়ীর রোগগুলি যেন আপনা আপনি পলাইয়া যাইত।

যোগীন্দ্রবাবুর ঔষধে, বিশেষ তাঁহার প্রদত্ত ষট্‌পল ঘৃতে আমি অনেকটা উপশম বোধ করিলাম।

কিন্তু প্রায় ছয় সাত মাস পূর্ব্ব হইতে আমি নিজের চিকিৎসা নিজে করিতেছিলাম। আমি সংযমে দীক্ষিত হইতেছিলাম, শুধু ইন্দ্রিয়-সংযম

নহে, বাক্যে-ব্যবহারে ও চিন্তায়। আমি বুঝিলাম, যদি কুচিন্তা মুহূর্ত্তেও স্থান দেই, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে আমার স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট হয়। সেই চিন্তা প্রবল হইয়া কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমার অনিষ্ট না করিয়া ছাড়ে না; সুতরাং কুচিন্তার পথে মনকে পাহাড়া দিতে শিখাইলাম। আরও দেখিলাম, বন্ধুগণের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় অনেক সময় গল্পের স্রোতে পড়িয়া কত কথা বলিয়া ফেলি, যাহাতে সৎ-অসৎ দুইরকমের জিনিষই থাকে, অনেক কথা বলি, যা না বলিলে ভাল ছিল, পর-কুৎসায় অলক্ষিতভাবে যোগ দেই, তখন বাক্যে সাবধান হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ব্যবহারিক জীবনের প্রতিও লক্ষ্য পড়িল। এক কথায় পরের দোষ, পরের কথা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, শিশু যেরূপ প্রজাপতির ডানা ছিঁড়িয়া আমোদ বোধ করে, সেইরূপ পরের চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া রূঢ়ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আনন্দ পাইতাম, এখন নিজের দিকে চোখ পড়িল।

এই চেষ্টা শুধু নৈতিক সূত্র অবলম্বন করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। আমি নাম জপ করিতে লাগিলাম, প্রতি রাত্রে শুইবার সময় চিন্তা করিতাম কি কথা দিন ভরিয়া বলিয়াছি, তাহার কোনটি না বলিলে চলিত, কি কাজ করিয়াছি যাহা যোগ্য হয় নাই, কাহার মনে ব্যথা দিয়াছি, কাহার অপকার করিয়াছি, পরের উপকার করিবার কোন সুযোগ হারাইয়াছি। যেখানে ত্রুটি হইয়াছে, সেইখানে জোর হাত করিয়া নামের পেছনে পেছনে ছুটিয়াছি, এবং বলিয়াছি "আমায় রক্ষা কর, কাল যেন এমনটি না হয়।"

সর্ব্বদা চণ্ডীদাস ও সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতাম। ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপর বর্ষা ও শরতের খেলা, পম্পা তড়াগের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী, রামের বীরমূর্ত্তি,—লঙ্কাকাণ্ডে নহে, কিন্তু যেখানে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া

কৈকেয়ীকে বলিতেছেন, "বিদ্ধিমাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলম্ ধর্ম্মমাশ্রিতম্," এবং শোকক্লিষ্ট দশরথের পদ প্রান্তে দাঁড়াইয়া বারংবার সান্ত্বনা দিতেছেন "ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্" এই পড়িয়া মনে হইত, আমিতো সেই দেশের মানুষ, যে দেশের লোক প্রাকৃতিক অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এইরূপ বিশাল মানব-আদর্শ আঁকিয়া গিয়াছেন!

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যামবঁধু বিনে গতি আর কেহ নয়।" আমার প্রাণ এই ছত্রের সাড়া দিয়া বলিত "শ্যামবঁধু বিনে গতি আর কেহ নয়।" কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ছিল এই শিক্ষা "আমি শ্যাম অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল-তুলসী দিয়া।" তিল তুলসী দিয়া যে দান করা যায়—তাহা আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। আমি কি তাঁহাকে এ দেহ তাঁর প্রীতির জন্য দিতে পারিব না? সে যে বড় শক্ত দান! আমি এমন কথা বলিব না যাহা তাঁর অপ্রীতিকর হইবে, এমন কাজ করিব না যাহা তার প্রিয় নহে, নিজের সুখের জন্ত কিছু করিব না, তাঁর প্রীতির জন্ত কাজ করিব। এ না হ'লে নিব্যূঢ় সত্বে তাঁহাকে আর দেহ কি করিয়া দিতে পারিলাম? সুতরাং তিনি যদি এ দেহের প্রভু হন, স্বামী হইয়া যদি এই দেহ গ্রহণ করেন, তবে ইহার সুখ-দুঃখ ধ্বংস কিছুতেই আমাকে পাইবে না। এ শিক্ষা কি সম্পূর্ণ করিতে পারিব? শুধু সোপানে পা দিয়াছি মাত্র; ইহা কি কখন বলিতে পারিব—"আমি নিজ সুখ দুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি।" নিজ সুখ-দুঃখ তাঁহার প্রীতিতে ডুবাইয়া কবে এত বড় কথা বলিবার অধিকার হইবে?

সংযম ও জপধারা প্রায় আড়াই বৎসর পরে আমি আবার কিছু কিছু করিয়া নিজ হাতে লিখিতে শক্তিলাভ করিলাম, পাঁচসাত মিনিট হাঁটিতে পারিলাম। যদিও ট্রামে উঠিলে—যানের ক্ষিপ্রগতিতে আমার পীড়া

বৃদ্ধি পাইত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় কিছু না খাইলে ফিট হইবার উপক্রম হইত, তথাপি ধীরে ধীরে যে একটু আরোগ্যের পথে আসিলাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার পূর্ব্বেই সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় 'পদ্মা' নামক কাব্য লিখিয়া—তরুণ বয়সে সরস্বতীর কুঞ্জে একটা জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। আমি মুখে বলিয়া পরের হাত লিখাইয়া এই কাব্যের সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধ যত দূর মনে হয়, 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বহুদিন আমার কোনো প্রবন্ধ আর কোনো কাগজে বাহির হয় নাই। বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রমথবাবুর সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

এবার কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম সমস্ত সাহিত্যিকগণ আমার ব্যথার ব্যথী। হীরেন্দ্রবাবু আমাকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন, তাঁহার সহিত যখনই দেখা হইয়াছে, তখনই কোন না কোন লাভ হইয়াছে—সে লাভ চূড়ান্ত লাভ—তাহা আধ্যাত্মিক জগতের। নাটোরের কোন সাহিত্যিক কনফারেন্সে তিনি গিয়াছিলেন, সেই ভূমিকম্পের সময়। পাকা বাড়ী কাঁপিতেছিল—সকলে সে বাড়ী ত্যাগ করিল, কিন্তু হীরেনবাবু "যৎবিধের্ম্মনসিস্থিতম্" বলিয়া নির্ভীকভাবে বসিয়া রহিলেন,—এই এক চিত্র। সেই ভূমিকম্পের সময় আমার মাতামহ গোকুলমুন্সী মহাশয় তাহার প্রকাণ্ড বাড়ীতে ছিলেন, দিনের মধ্যে রোজ ৪।৫ বার ভূমিকম্প হইত, তাঁহার নাটমন্দির ও নহবৎখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাঁহার ঘরের জানেলা দরজা ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিত,—বাড়ীর চাকর, দারোয়ান, পাহারা, বরকন্দাজ, নায়েব এবং সন্ততিবর্গ সকলে পালাইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতল গৃহের বিশাল হল-ঘরে একা নির্ভীকচিত্তে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী জমিদার রামকৃষ্ণমুন্সীর বাড়ী যে অঞ্চলে—

সেখানে ভূমিকম্প হয় নাই—সুতরাং তিনি গৃহ ছাড়েন নাই। "রামকৃষ্ণ বলিবে গোকুল ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া গেল, এই অপমানের থেকে মৃত্যু ভাল।" নবতিবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের এই বীরত্ব রাজসিক বীরত্ব, কিন্তু হীরেনবাবুর এই সাত্ত্বিক বীরত্বের তুলনা কোথায়? একটি চিত্র স্বপ্রতিষ্ঠার আর একটিতে ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভর। কলিকাতায় যখন প্লেগ লাগিল, তাঁহার বাড়ীর চাকরবাকরদের মধ্যে সেই রোগ দেখা দিল—তখন ও হীরেনবাবুর সেই একই প্রশান্ত ভাব—সেই "যৎবিধের্নসিস্থিতম্" আমি যতবার ভয় পাইয়া বিচলিত হইয়া তাঁহার নিকট যাইতাম, ততবার দেখিতাম, নির্লিপ্ত পুরুষের ন্যায় তিনি বসিয়া আছেন, তাহার শৈল মহান গাম্ভীর্য্য ও অবিম্রিত শান্তির ছবি দেখিলে আমার ভিতরকার ঝড় থামিয়া যাইত,—রুদ্রবেশে প্রভঞ্জন হিমালয়ের গায় ঠেকিয়া যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়—সেইরূপ তাঁহার বাড়ীর বিপদ আপদ সমস্ত তাঁহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিত না। এই বিকল্পবিহীনতা তাঁহার মহা দান। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হইয়াছে এই মহাদানের কণিকা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছি। যখনই ভয়ের কথা বলিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিব, মনে ভাবিয়া গিয়াছি, তখনই তাহাকে ধীর, স্থির, শান্ত, সমাহিত ও আত্মস্থ দেখিয়াছি, উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি, মিষ্টত্বে ভরপুর পাইয়াছি—অপর রাজ্যের আলোকমণ্ডিত দেখিয়াছি। সভা-সমিতিতে তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সে পক্ষের জয়ে অবশ্যম্ভাবী। প্রতিপক্ষের মস্তক তাঁহার নিকট নত হইয়াছে, তাহার বিজয়শ্রীযুক্ত উপসংহারের পর আর কেহ উঠিতে সাহস করে নাই—অথচ তিনি যাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন,তাঁহারা ও তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে; তাঁহার ভাষায় গ্রাম্যতা, অন্যায় আক্রমণ ও শ্লেষ কিছুই থাকিত না। শরৎশাস্ত্রীর সঙ্গে বাঙ্গলাভাষা লইয়া সাহিত্য-পরিষদে

তাঁহার অনেক বিতর্ক হইয়াছে। তাঁহাকে তিনি প্রকারান্তরে মূর্খ, অজ্ঞ সকলই বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভাষার বাহাদুরী এই যে তিনি তীক্ষ্ণ বাণগুলি যেন সরভাজার মোড়কে আবৃত করিয়া ব্যবহার করেন—কাহারও তাহাতে মনে কষ্ট হয় না, অভিমান আহত হয় না। শরৎশাস্ত্রীর সংস্কৃতের জ্ঞানের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া একদা তিনি বলিলেন" কিন্তু শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পড়েন নাই, এখনকার পণ্ডিতেরা যে সকল সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, বহু ভাষার যে তুলনামূলক মানদণ্ড স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রীমহাশয়ের তাহা জানা নাই, এইখানে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বিরোধ মিটিবার নহে।" এইভাবের কথাগুলি প্রীতির রসান দিয়া এমনই মিষ্টভাবে তিনি বলিয়া গেলেন যে শরৎশাস্ত্রী নিজেও প্রীত হইলেন। মনু যে বলিয়াছেন সত্য বলিতে হইবে ও প্রিয় কথাও বলিতে হইবে, তাহা হীরেন্দ্রবাবু যে ভাবে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। ইহার একমাত্র গোপনীয় সূত্র এই যে হীরেনবাবুর চিত্ত ভগবানে স্থিত, তাহার কোন স্থানে বিদ্বেষ নাই।

এই সময়ে নগাধিরাজের ডিক্ অভিধানের মত সুরেশ-সমাজপতি মহাশয় আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন, এবং আমার পীড়ার অবস্থা ও আর্থিক অভাব দেখিয়া চিরবন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া যাইতেন। কিন্তু যখন আমি একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলাম ও মূল্য লইয়া বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলাম, তখন তিনি ততটা সহৃদয়তা রক্ষা করিতে পারিলেন না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য হীরেন্দ্রবাবু ও সুরেশ সমাজপতি ভারতমিহির মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারী কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয়কে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, এই ঋণ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যতই সাংসারিক ব্যয় নির্বাহকল্পে আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া অপরাপর পত্রিকায় প্রবন্ধ

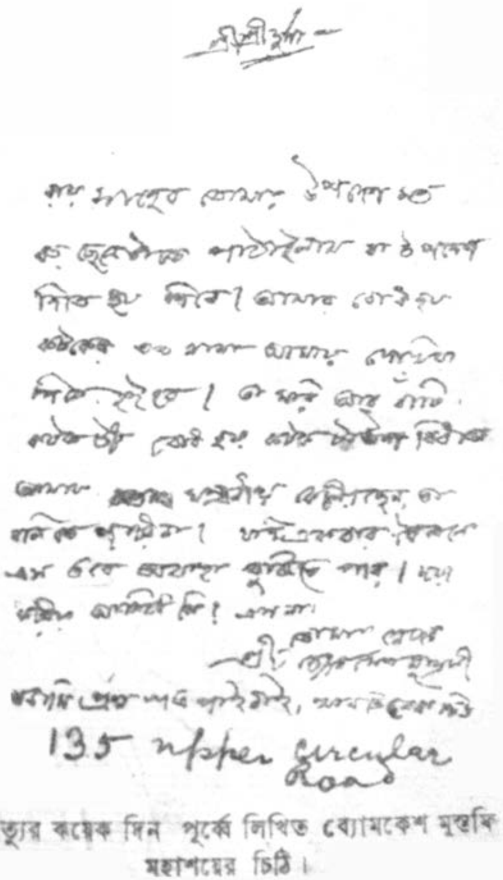
লিখিতে লাগিলাম, ততই সাহিত্য-পত্রিকায় শবের স্থায় আমার প্রবন্ধাদির ব্যবচ্ছেদ চলিতে লাগিল। আমি অসমর্থ, ব্যাধিপীড়িত, নাতিক্ষুদ্র একটী পরিবারের ভারে ব্যতিব্যস্ত, আমি কেমন করিয়া বিনামূল্যে সাহিত্যে প্রবন্ধ লিখিব? কুমিল্লা থাকিতে আমি সাহিত্যে লিখিতাম, তাহার অর্থ এইরূপ শুনিয়াছিলাম, যে সাহিত্যপত্রে আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিয়া সম্পাদক আমার মত অকৃতীকে সাহিত্য জগতে প্রচারিত করিয়া দিয়াছেন এবং সেই কৃতজ্ঞতায় উক্ত পত্রিকায় চিরকাল আমি বিনা পারিশ্রমিকে লিখিতে বাধ্য। আমি উক্ত পত্রিকায় প্রায় প্রতিমাসে প্রকাশিত দারুণ শ্লেষ সহ্য করিয়াও তাহাতে দুইএকটি প্রবন্ধ না লিখিয়াছি এমন নহে। কিন্তু বেশী লিখিতে পারি নাই। যাহাহউক আমি যত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা আমি আর মনে স্থান দিব না, এখন সুরেশবাবু স্বর্গগত। তিনি স্বর্গ হইতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি রবি-বাবুর কথার ভগবানকে প্রার্থনা করিয়া জানাইতেছি "যে কেহ মোরে দিয়াছ দুঃখ, চিনায়েছ পথ তাঁর, তাহারে নমি আমি।"

শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় মানসী ও মর্ম্মবানীতে সুরেশবাবুর কথা উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ভুল ছিল,—সুরেশ বাবুর জীবিত কালেই আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় মানসী ও মর্ম্ম বাণীর আফিস হইতে কোন সুরেশ-ভক্ত লোক আমার প্রতিবাদটির উপর যথেচ্ছারূপ কলম চালাইয়া উহাকে বিকৃত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এইরূপ অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া ঘাটাঘাটী করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমি নীরব ছিলাম। সুরেশ বাবু আমার প্রতি অনুকূল-প্রতিকূল যাহাই থাকুন না কেন, আমি তাঁহার পদধূলি আমার বাড়ীতে সর্ব্বদাই পাইতাম, এবং সাহিত্যের জন্ত প্রবন্ধের দাবী তিনি কখনই

ছাড়িতেন না। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি বেহালা যাইয়া আমাকে প্রবন্ধের জন্ত তাগিদ দিয়াছিলেন।

আমার কাছে এই সময় সর্ব্বদা আসিতেন ব্যোমকেশ মুস্তফি। তাঁহার মত সুদর্শন, প্রিয় ভাষী, অনুরক্ত বন্ধু কোথায় পাইব? আমরা পরস্পরকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতাম। পৃথিবীর যে বন্ধু যাহা করিবেন, ব্যোমকেশ অযাচিত ভাবে যাইয়া তাহার সাহায্য করিতে দাঁড়াইত। এত কর্ত্তব্যের ভার কেহই একাকী সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। তাহার শরীর ভাল ছিল না—সুতরাং প্রায়ই সে প্রতিশ্রুত কার্য্যের সবটা করিতে না পারিয়া সলজ্জ ও সপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা চাহিত। সাহিত্য-পরিষদের জন্ত তাঁহার খাটুনির অবধি ছিল না। এবং পরিষদের ইষ্টের জন্ত সে ডাকাতি করিতেও বোধ হয় পশ্চাৎ পদ হইত না। একবার সে আমার বাড়িতে ডাকাতের মত পড়িয়া আমার ১০।১৫ খানি ভারতী দপ্তর মত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, ইহার পরে সে আসিলে আমি পুস্তকের ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া ফেলিতাম। তাহার মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে সে আমাকে নিজ হাতে যে চিঠি লিখিয়া ছিল, তাহা আমার কাছে আছে। মৃত্যুর-আরক্ত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে লেখনী চালাইয়াছিল, চিঠিখানির আঁকা বাঁকা অক্ষর সেই করুণ ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালার প্রধান পরীক্ষক ছিলাম। সেও সেইবার পরীক্ষক ছিল, সে কাজ সারিতে না পারিয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে করিতে এই কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেল। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর পুত্র হরনাথ ও আমি তাহার সেই অবশিষ্ট কাজ সারিয়া লইয়াছিলাম। প্রফুল্ল কুসুমটি যেরূপ হাসিতে হাসিতে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আবিষ্ঠিত ভারতীয় সেবায় সে হাসিতে হাসিতে প্রাণপাত করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে আমি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাবুদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়



135 Upper Circular Road

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে লিখিত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের চিঠি।

লাভ করি। পাল্কী করিয়া গগন বাবুদের বাড়িতে যাইয়া দেখিলাম, তিনটি ধ্যানী বুদ্ধের মত, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র তিন ভাই আলখাল্লা পরিয়া বসিয়া আছেন। গগনবাবু জ্যেষ্ঠ হইলেও দেখিতে সর্ব্ব কনিষ্ঠের মত, খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ। অবনীন্দ্রবাবু সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মত দেখিতে, দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যাম-রূপ। তিন ভাইএরই হাসি মুখ। অবনীন্দ্র-বাবুর হাস্যে মাঝে মাঝে একটু সরল ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠে। ইঁহারা আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়া মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ইঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিয়াছে; আমার আপদে বিপদে সর্ব্বদা ইঁহাদিগকে পাইয়াছি। অবনীন্দ্রবাবু তখন হ্যাভেল সাহেবকে লইয়া দেশীয় চিত্র-শালার পত্তন দিতেছিলেন, তখনই তাঁহার সুবিখ্যাত 'বিরহী যক্ষ' 'বুদ্ধ ও সুজাতা' 'ইংরেজের হাতে সাহ আলম' প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। একটা রূপা-বাঁধা হুকা হাতে, ইঁহাদের আশ্রিত মতিবাবু নামক একটি বৃদ্ধব্রাহ্মণ সর্ব্বদা কাছে বসিয়া থাকিতেন। মতিবাবু গভর্ণমেণ্ট হইতে কিছু পেন্সন পাই-তেন, এবং গগন বাবুদের নানা কাজের ভার লইয়া সম্পাদন করিতেন। ধরুন, যেমন ইঁহারা অভিনয় করিবেন, তাহার প্ল্যাটফরম্ তৈরী করিতে হইবে; ষ্টার, মিনার্ভা কিম্বা অপর কোন নাট্য-সম্প্রদায় যদি ইঁহাদের বাড়ীতে অভিনয় দেখাইতে আহুত হইতেন, তবে চালা-ঘর ও রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, মতিবাবুই ছিলেন কর্ম্মকর্ত্তা। ইহা ছাড়া বাবুরা সর্ব্বদা বাঙ্গলা বই কিনিতেন, মতিবাবু গুরুদাসবাবুর দোকান হইতে তাহা আনিয়া দিতেন। এই সকল ব্যাপার লইয়া গগনবাবুরা ইঁহাকে প্রায়ই ক্ষেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিতেন। "আজ কত লাভ হইল ?" প্রশ্ন হইলেই মতিবাবু চটিয়া লাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই বকিতে থাকিতেন। গগন বাবুরা তাঁহার গালাগালিটা বেশ হাসিতে হাসিতে সহিয়া লইতেন,

যেহেতু নতিবাবু ছিলেন তাঁহাদের পিতৃ-সহচর। উত্তর কালে গগনেন্দ্র-বাবু বিদ্রূপ চিত্র আঁকিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার হাত পাকাইয়া লইয়াছেন, নতিবাবুকে দিয়া। নতিবাবু যখন যেভাবে বসিতেন, যে ভঙ্গী করিয়া কথা কহিতেন, হুকাটি নামাইতেন, কিম্বা হুকা ধরিয়া যে ভাবে নিবিষ্ট হইয়া তন্দ্রা উপভোগ করিতেন, তাঁহার সেই ভাবের শত শত ছবি গগনবাবু আঁকিয়াছেন। "রাইফেল রেঞ্জে" যেরূপ গোরা সৈনিকেরা লক্ষ্য স্থির করিয়া হাত ঠিক করিয়া লয়, নতিবাবু ছিলেন গগনবাবুর সেইরূপ চিত্র-লক্ষ্য। তাঁহার হাতে নতিবাবুর যে সকল ছবি আঁকা হইয়াছে, বোধ হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন; তাঁহার সৃষ্টির এরূপ হুবহু নকল হইতে পারে, ইহা এই সকল ছবি না দেখিলে তিনিও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। অবনীন্দ্র বাবু সর্ব্বদা তাঁহার লেখা ও ছবি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার চিত্র রঙ্গের কোমল রেখা ও মৃদু মাধুরী দেখিয়া সমস্ত য়ুরোপ মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বাঙ্গলা রচনায় পল্লী-সৌন্দর্য্যের যে মোহিনী আছে, সে যাদুকরী বিদ্যা তাঁহার নিজস্ব, অপর কোন লেখক এপর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি কলম ও তুলি দিয়া কেবলই ছবি আঁকিয়া যান। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করিতে গেলে নিত্য-প্রত্যক্ষ অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র বিষয় গুলি তাঁহার হাতে আশ্চর্য্য সুন্দর কোন স্বপ্নের ন্যায় হইয়া উপস্থিত হয়, তাহা সাহিত্যে শিল্পের কি উচ্চ স্থান তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করে। তাঁহার রাজস্থানের কাহিনীগুলিতে ভাটিয়াল সুরের মত একটা করুণ সুর আছে, তাহা তাঁহার সুকোমল হৃদয়ের ব্যঞ্জনা করিতেছে। বিরহী যক্ষের চিত্রটিতে যে লাল রঙ্গের আভা যক্ষের কপালের চন্দন-রেখায়, ও বিম্ব অধরোষ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কালিদাসের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যা। বোধ হয় মল্লীনাথ যাহা বুঝাইতে পারিতেন না, চিত্রকর

তাহা বুঝাইয়াছেন। 'বুদ্ধ ও সুজাতা' চিত্রে ভক্তি-বিনম্রা ললনার প্রণতি ও সাদর নিমন্ত্রণ নারীহৃদয়কে যেন একটা পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইতেছে,—ভক্তি যেন রূপ ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে।

অবনীন্দ্র বাবু সেই একভাবেই আছেন, সেই একলক্ষ্য। চেহারা ও যে ২০ বৎসরে বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নহে। মাঝে সি, আই, ই, উপাধি পাওয়ার পরে একটু বাঁকিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বঙ্কিমত্ব বাতরোগে কিম্বা বাঁকা শ্যামের শ্রী দেহে ফলাইবার জন্য সে সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। আমার বিশ্বাস সরকারী উপাধির গুরু ভার সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ হইয়াছিলেন। ব্যঙ্গ ছাড়িয়া দিলে, বাত রোগ তাহার দেহটি কিছু কালের জন্য টানিয়া ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়াছে—এখন আবার সেই হাসি প্রফুল্ল-মুখে স্নিগ্ধ মধুর চাউনি লইয়া সম্পূর্ণ ঋজু দেহে তিনি বিদ্যমান আছেন।

কিন্তু গগনবাবুর খেয়ালের অন্ত নাই। সহসা স্বদেশী চিত্রের প্রতি অনুরাগের মাত্রা চড়িয়া গেল, অমনই প্রাচীন বড় বড় বহুমূল্য বিলাতী ছবি তিনি নাবাইয়া ফেলিয়া তাহার জায়গায় অজান্তা গুহার চিত্র, ক্যাট সুটা নামক জাপানি চিত্রকর অঙ্কিত রামায়নের চিত্র, কৃষ্ণের রাস-লীলার চিত্র দিয়া তিনি দেয়াল ছাইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ পাথর ও অষ্ট ধাতুর প্রাচীন মূর্ত্তি, এবং মোগলাই চিত্রের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যখন যে খেয়াল গগন বাবুর মাথায় আসে তাহা যেন তাঁহাকে একবারে পাইয়া বসে। এই খেয়াল একটু "মন্দা" না পড়িতে পড়িতেই, তিনি তাঁহার হল-ঘরটির পরিবর্ত্তন করিতে লাগিয়া গেলেন; নীচেকার ঘরটা ছাড়িয়া দিয়া উপরের ঘরটায় আসিলেন, এবং বৎসরে দুবার করিয়া দেয়া-লের চিত্রিত লতাফুল গুলি নূতন করিয়া আঁকাইতে লাগিলেন। ঠিক কোন

উৎসবের সময় সেরূপ লোকজন ব্যস্ত হইয়া কাজ করে,চিরকালটা ইনি সেই ভাবে কাটাইয়া আসিতেছেন। ঠাকুর-বংশের পুরাতত্ত্ব সম্বলিত চিঠি-পত্র লইয়া সে গুলি টাইপ করিতে এক সময় লাগিয়া গিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার অন্য কোন দিকে দৃষ্টিই ছিলনা,—তারপর বিনা-তারে টেলিগ্রাফীর ব্যবস্থা করিয়া এঘর হইতে ওঘরে কথা বার্ত্তা চালাইয়া কতকদিনের জন্য তাহাই একটা উৎসবে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় নন্দলালবসু চিত্র-শিক্ষার জন্য আসিলেন। তুলির বড় বড় টানে তিনি এমনই ছবি আঁকিতে লাগিলেন যে তাহা আমাদের বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল—তাঁর সকল ছবিতেই মৌলিকত্ব থাকিত। অভিমানিনী কৈকয়ীর ছবিতে তাঁহার লাল রঙের শাড়ীর লহরে লহরে যেন রাগের রঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিয়া জ্বলন্ত অভিমানকে আঁকিয়া ফেলিল, এবং মৃত সতীর একখানি হস্ত রজত গিরিনিভ স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া দেখাইল যে মৃত্যুর পরও অনুরাগ চলিয়া যায় নাই। গগন বাবু ও অবনী বাবু নন্দলালকে দিয়া অজান্তার ছবির প্রতি-লিপি আঁকাইতে লাগিলেন—এই ভাবে স্বদেশী চিত্রশালার প্রথম সম্পদ রচিত হইতে লাগিল।

গগনবাবুর শেষ প্রিয়তমা হইয়া চুম্বন গ্রহণ করিলেন চিত্রকলা, তাহা বিদ্রূপে যেমনই কৌতুক ও হাস্যের উৎস, আবার ভক্তি-সাধনা ও কবিত্বে তেমনই চিত্তাকর্ষক। সমাজের সমস্ত ছলনা, কপটতা ও ভাণ, তাঁহার চোখে যেমন স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়িয়াছে,বাঙ্গালী আর কোন চিত্রকরের বোধ হয় সেরূপ পড়ে নাই। হাস্যরস ক্ষণ-স্থায়ী,কিন্তু ব্যঙ্গরসের ছবি আঁকিয়া গগনবাবু নীতিজ্ঞের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এ চাণক্যের শ্লোক নহে,চিত্রকরের চাবুক—ইহা কম তীব্র নহে। গগনবাবু চৈতন্যের ছবি আঁকিয়া মন্দির-যাত্রীর ভিড় দেখাইয়া প্রেমও ভক্তির পথে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন,তাহা ভাবুককে বিস্মিত এবং কবিকে উদ্বোধিত করিবার শক্তি রাখে।

গগন বাবুর নানা খেয়ালের মধ্যে যে কর্ম্মঠতা ও উদ্যম দৃষ্টি হয়, তাহা তাঁহার ক্ষিপ্র, অসহিষ্ণু প্রতিভাকে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইতেছে। ঠাকুরবংশে ইহাঁরমত বিচিত্র মনস্বিতা আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি। বাহিরে একথা কেহ হয়ত স্বীকার করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু দৈনন্দিন প্রত্যেক ঘটনায় যে ইনি কত বিচিত্র ভাবে এই প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা আমার চির বিস্ময়কর। তিনি যেন নিত্যই নূতন যুগের লোক, সভ্যতার আতুর-ঘরে নিত্য জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার গত জীবনের পত্রগুলি দিবাশেষে রোজই শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে এবং প্রতিদিন প্রত্যুষে নূতন জীবন সদ্য স্ফুট কুসুমের ন্যায় নূতন সৌন্দর্য্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে। তিনি তাঁহার মন্দিরে বাসি-ফুল রাখিয়া আবর্জ্জনার সৃষ্টি করেন না, নূতনের জন্য তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অভ্যর্থনার জায়গা হইতেছে। তাঁহার মনস্বিতার বহু লক্ষণের মধ্যে, তাঁহার জীবন-ইতিহাসের পত্রগুলির নিত্য ওলট-পালটের মধ্যে একটা জিনিষ স্থায়ী দেখিয়াছি—তাহা তাঁহার সহৃদয়তা। সম্পূর্ণ রূপে প্রতিদান, প্রতিষ্ঠা ও সাংসারিক চিন্তার উর্দ্ধলোকে থাকিয়া এই সহৃদয়তা দুঃখীর ব্যথায় অতি গোপনে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ইহাঁদের তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পভাষী সমরেন্দ্র। ইনি একান্ত ভাবে অনাড়ম্বর, অনেক সময় ইহাঁর মুখে কথাটি নাই। কিন্তু হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত কথা একটা সরল হাসিতে বোধ হয় বাক্যাবলী হইতে ও বেশী ব্যক্ত করে। সেই হাসিতে শুধু তাঁহার ঠোঁট দুটি উজ্জ্বল হয় না, গোঁপ জোড়া পর্য্যন্ত হাসিয়া ওঠে। অনেক সময় মনে হইবে যে ইনি কিছুই জানেন না, একান্ত নীরিহ ভাল মানুষ। কিন্তু ভাব-রাজ্যের ডুবারু হইয়া কেহ এই প্রশান্ত জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিলে অনেক রত্ন পাইবেন। ইনি দিনরাত্রি পুস্তক পড়েন, ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে

ইহার জ্ঞান অসাধারণ। সাধারণত ইনি জমিদারির কাজ কর্ম্ম দেখেন, বলিয়া ইহার শিক্ষা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

আমি এই তিন ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র, গগনবাবু,কালি কৃষ্ণ ঠাকুর,প্রমথ নাথ রায় চৌধুরি,রাজা মন্মথ-রায়চৌধুরি, ত্রিপুরেশ্বর এবং শরৎ কুমার রায় এক সময়ে আমাকে মাসিক বৃত্তি দিয়াছিলেন। আমি দুরবস্থার সময় ইহাদের সাহায্য লাভ করিয়াছি। এখনও ত্রিপুরেশ্বর এবং কাশিমবাজারের মহারাজা সেই বৃত্তি চালাইতেছেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবার পর আমার প্রতি বঙ্গীয় সমাজ সহৃদয়তার পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কত লোকের নিকট যে অযাচিত ভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। ছোট লাট্ উড্‌বারণ সাহেব স্বয়ং আমার জন্য মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী এবং অপর দুই একজন মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। চিফ্ সেক্রেটারী ম্যাক্‌কার্সেন সাহেব অনেক স্থান হইতে আমার জন্য সাহায্য আদায় করিয়া পাঠাইয়াছেন। বরদাচরণ মিত্র মহোদয় ময়ূরভঞ্জাধিপতির নিকট হইতে ১০০০, টাকা আদায় করিয়া আমাকে প্রদান করেন। এমনও হইয়াছে যে অযাচিত ভাবে কোন কোন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া ১০০।২০০, শত টাকা অতি বিনয়ের সঙ্গে দিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু গগনবাবুকে একবার মাত্র আমার কথা বলিয়াছেন, গগনবাবুর সহৃদয়তার তুলনা নাই, আমি না চাহিতেই তিনি আমার বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ১৮০০, টাকা দিয়াছিলেন। প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া রাতদিন খাটিয়া আমি বঙ্গ-ভারতীর এক কালে সেবা করিয়াছিলাম, দেবী আমাকে লুকাইয়া অজস্র দান করিতেছিলেন। ১৯০৫।৬ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত আমি একরূপ শয্যাগত পীড়িত অবস্থায়ই ছিলাম, কারণ তখন দুই চারিদিন বাহিরে একটু ভ্রমণাদি করিতে পারিলেও মোটামুটি অনেক সময়ই বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম, কিন্তু তখন লিখিবার শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। প্রবন্ধাদি লিখিয়া মাসিক ১৫০।২০০, টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য ও আমার রোগ-ক্লেশে সহানুভূতি দেখাইয়া আমাকে যাঁহারা সাহায্য দিয়াছিলেন,তাহাদের সেই অর্থের পরিমাণ ১০,০০০,টাকার কম হয় নাই, সুতরাং এই সময়ে আমার আর্থিক অভাব দূর হইয়া হাতে কয়েক হাজার টাকা জমিয়াছিল।

যখন একান্ত বিপন্ন হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি,তখন নগেন্দ্রবাবুর (প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব) ন্যায় রামেন্দ্রবাবুও আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে আসিতেন। কি করিয়া তিনি আমার সাহায্য করিবেন, সাহিত্যিক গৌরব দিবেন—তাহাই ছিল তাঁর সর্ব্বদা চেষ্টার বিষয়। তিনি আমাকে সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য করিবেন—সেই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, যে সভায় এই প্রস্তাব উথাপন করিবেন,—সেই সভায় সুরেশ সমাজপতি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে বাধা দিবেন বলিয়া রামেন্দ্রবাবুকে ভয় দেখাইলেন। যদিও বিশিষ্ট সভ্য সম্বন্ধে তখনও খুব কড়াকড়ি নিয়ম হয় নাই, তথাপি এইরূপ প্রস্তাব সর্ব্বজনসম্মত হইলেই শোভন হয়। তিনি আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলিলেন—"এই বাধা দেওয়ার মুখে প্রস্তাবটি এখন আর করিতে চাই না।" আমি বলিলাম,"বিশিষ্ট সভ্য না হইলে আমি মরিয়া যাইব না, আপনি কেন এজন্য দুঃখিত হইতেছেন?" কিন্তু তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাহার পরের সভায় "বিশেষ সভ্য" নামক এক শ্রেণীর সভ্যসৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার নাম করিবেন, স্থির করিলেন। সুরেশবাবু আমাকে বলিলেন, "কানা ফকির ভিক্ মাঙ্গে—এখন যান

বিশেষ সভ্য তালিকা ভুক্ত হউন গিয়া, আমি এবার বাধা দিব না।" আমি রামেন্দ্রবাবুকে বলিলাম "যদি আপনি আমার নাম বিশেষ সভ্যরূপে প্রস্তাব করেন, তবে আমি দাঁড়াইয়া অস্বীকার করিব।" সুতরাং আমি বিশেষ সভ্যভুক্ত হইলাম না—আবদুলকরিম,অতুল গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বোধ হয় সেইবার প্রস্তাবিত হইয়াছিল। রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে একদিন আমি প্রাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি কষ্টে সৃষ্টে ভুঁড়িটা সরাইয়া তাঁহার নিকট আমার একটা জায়গা করিয়া দিয়া একটা উপাধান অবলম্বন করতঃ জলমগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া থাকে সেইভাবে রহিলেন। আমি বলিলাম "কি জন্য আমার তলব হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "আমি একটি লোকের প্রতীক্ষা করিতেছি,তিনি আসুন,তারপর বলিব।" কথাবার্তা তিনি খুব কমই বলিতেন, যেখানে কথার দরকার, সেখানে শুধু মৃদুহাসি এবং ভাবের আধিক্য হইলে উচ্চহাস্য। এই হাসি দ্বারা তিনি আদর-আপ্যায়ন বুঝাইতেন,বিদায় গ্রহণের ভদ্রতা জানাইতেন, প্রাণের সহৃদয়তা বুঝাইতেন,—হাসিই ছিল তাঁর সম্বল। তাঁর প্রাণের কথা ঐ হাসিতে যত বোঝা যাইত, কথায় বোধ হয় ততটা বুঝাইতে পারিতেন না।

এমন সময় একটি ধীর স্থির যুবক তথায় আসিলেন, অতি সাধারণ বেশ-ভূষা, গৌরবর্ণ, মুখচোখে অধ্যবসায় ও তেজ—এবং সকলের অপেক্ষা একটা স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সহৃদয় চরিত্র-দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। রামেন্দ্র বাবুকে ইঁহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন এবং আমাকে পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎচন্দ্র রায়। ইনি আপনার সঙ্গে গোপনে কি কথা বলিবেন" আমি কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সেই ঘরের একটা নিভৃত স্থানে দাঁড়াইলাম। কুমার বাহাদুর বলিলেন "আমি আপনার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িয়াছি, রামেন্দ্রবাবু আমাকে আপনার

অবস্থা বলিয়াছেন—যদি অনুমতি দেন, তবে আমি আপনাকে সামান্য কিছু সাহায্য করিতে চাই।" এই বলিয়া ৫০০,টাকার নোট আমার হাতে দিলেন—"আর মাসিক ২০ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে চাই, গ্রহণ করিবেন কি?" আমি নির্ব্বাক হইয়া কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজিতেছিলাম। এমন সময় রামেন্দ্রবাবুর আহ্বান হইল; দেখিলাম এই সাহায্য দিতে দেখিয়া তাঁহার মুখে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি খেলিতেছে।

কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি বঙ্গের ইতিহাস-সেবায় জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; এরূপ জলন্ত অনুরাগ খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার মুক্তহস্ত দানে একসময় সাহিত্য-পরিষদ্ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বীরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার দান আছে—ঘোষনা নাই, তাহার কথা অতি স্পষ্ট,—মিথ্যা ভদ্রতা এবং মিষ্টভাষা দ্বারা তিনি কাহাকেও কখন প্রলুব্ধ করেন না; যাহা করিবেন তাহা প্রাণপণে গোপনে নিজকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়া করিয়া থাকেন। তিনি বাঙ্গালা অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন, দুই একখানি ছাপা হইয়াছিল। এই লেখাগুলি আমি পড়িয়া দেখিয়াছি, সাধারণ উপন্যাস গুলি হইতে এইগুলিতে অনেক বেশী কৃতিত্ব আছে। কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অসংখ্য টাকা দান করিয়াও ইনি নিজের লেখা ছাপাইতে ব্যয় করিতে বিশেষ সম্মত নহেন। তাঁহার বিনম্র প্রতিভার লাজুকতা যেমনই মধুর, বঙ্গীয় ঐতিহাসিক চর্চ্চার প্রাণ স্বরূপ হইয়াও নিজের যশের ডঙ্কানিনাদ শুনিতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা ও তেমনই মধুর। তিনি প্রেরণা দিয়া যাঁহাদিগকে দিয়া কার্য্য করান, স্বীয় প্রাপ্য যশের মুকুট তাহাদিগের মস্তকে পরাইয়া সুখী হইয়া থাকেন। আমাকে তিনি ৪।৫ বৎসর মাসিক ২০, টাকা বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার

হেমেন্দ্রকুমার জ্যোতিষ ও চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত—কুমার শরৎকুমারের ন্যায় তিনি হয়ত দৃঢ় চরিত্র নহেন, কিন্তু এমন মধুর বিনয় ও অমায়িকতা এমন শেফালী-শুভ্র নির্ম্মলতা খুব অল্পই পাওয়া যায়।

কুমার শরৎকুমার কবিকঙ্কণের হস্ত লিখিত পুঁথিখানি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন,—তিনি এবং রামেন্দ্রবাবু বিচারপতি সারদা-চরণ মিত্র মহাশয়কে ধরিয়া বহু চেষ্টার ফলে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিলেন। পুঁথিখানি নকল করাইয়া সম্পাদন করিবার ভার হইল আমার উপর। আমি প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যকে দিয়া তাহা নকল করাইতে লাগিলাম। এই পুঁথি কবিকঙ্কণের হাতের লেখা বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চাৎভাগের কয়েকটি পাতা নাই; সুতরাং সন তারিখের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই পুস্তকের মধ্যে যে মুকুন্দরামের হাতে লেখা আছে, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। পুঁথিখানি তালপাতায় লেখা। অক্ষরগুলি সুন্দর,—ভাল লেখক দিয়াই কবিকঙ্কণ নকল করাইয়াছিলেন, পরন্তু লেখাগুলির মাঝে মাঝে, আমার যতদূর মনে পড়ে,—লাল কালীতে সংশোধন আছে, কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ছত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ছত্র লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং কবি ছাড়া অন্য কেহ এরূপভাবে তাঁহার লেখায় কলম চালাইয়াছেন সম্ভব নহে। সংশোধিত ছত্র কবির নিজ হাতের লেখা বলিয়াই বোধ হয়, সে লেখাগুলি তত সুন্দর নয়, বায়ুনপণ্ডিতের লেখার মত কতকটা জড়ান লেখা। এই পুঁথির মধ্যে একখানা দলিল ছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি;—সেই দলিলে দেখা যায়, বাঁরাখাঁ নামক কোন শাসনভার প্রাপ্ত ব্যক্তি মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন, দলিলের তারিখ ১৬৪০খৃঃআমরা কেতকীদাস-ক্ষেমানন্দের মনসাদেবীর ভাসানে এই 'বাঁরাখাঁর' নাম পাইয়াছি, শেষোক্ত কবি লিখিয়াছেন, বাঁরাখাঁ যুদ্ধে নিহত হইলে পর তিনি মনসা মঙ্গল রচনা

সুরু করেন। মুকুন্দরাম-স্থাপিত সিংহবাহিনীর মন্দিরেই এই পুস্তক পূজিত হইতেছিল এবং মুকুন্দরামের বংশীয়দের এবং দামুন্যাগ্রামের অপরাপর লোকের বিশ্বাস যে পুথিখানি মুকুন্দরামের নিজের। সুতরাং যখন শিব-রামের দলিল ঐ পুঁথির মধ্যে ছিল, এবং বাড়ীর প্রবাদ যে পুঁথিখানি স্বয়ং কবির এবং যখন পূর্ব্বোক্তভাবের সংশোধন কাব্যের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, তখন পুস্তখানি অবশ্য মুকুন্দরামের বলিয়া আমরা মানিয়া লইলাম। কিন্তু সংশোধনের অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ কবির স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

এই পুঁথিখানি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাঁচ শত টাকা এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তিন শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিবার অভিপ্রায় আমার নিকট ব্যক্ত করেন। আমি রামেন্দ্রবাবুকে তাহা বলিয়াছিলাম। কবিকঙ্কণের বংশধর যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ পুঁথি ফিরাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া আমার বাড়ীতেই ছিলেন। কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, যদিও পূর্ব্ব-পুরুষ প্রাপ্ত এই বংশ-গৌরব ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোনই প্রশংসনীয় গুণ দেখি নাই। বয়স প্রায় ৭০, আমার ছেলেদেরে দিয়া দিন রাত্র তামাক সাজাই-তেন ও কাসিয়া কাসিয়া ধূমোদগীরণ করিতেন,—পানরসসিক্ত নিষ্ঠিবন দ্বারা আমার নূতন বাড়ীখানির দেয়াল রঞ্জিত করিতেন এবং কোন স্থানে বাহির হইয়া গেলে যত রাজ্যের ধূলি ও কাদাতে ছিন্ন চটির অভ্যন্তরস্থ শ্রীপাদপদ্ম লাঞ্ছিত করিয়া সেই লাঞ্ছনায় পর্য্যাপ্ত ভাগ আমার শয্যায় প্রদান-পূর্ব্বক অকুণ্ঠিত চিত্তে বিরাজ করিতেন।

পুঁথি নকল হইয়া গেল, কিন্তু তখনও মিলাইতে পারি নাই। ইতি-মধ্যে রামেন্দ্রবাবু আমাকে তাড়া দিয়া বলিলেন—"কই, শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেলুন, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুঁথির জন্য তাড়া দিচ্ছেন, বই শীঘ্র

ফেরৎ দিতে হবে।" ইহার মধ্যে উক্ত ভট্টাচার্য্য একদিন আমায় বলিলেন "দীনেশবাবু, আমাব বড় বাজারের এক শিষ্য বইখানি দেখিতে চাহিতেছে—মহাপুরুষের হস্তাক্ষর, সে দেখিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে চায়—দুই এক দিনের জন্য দিন্, আমি তাঁহাকে দেখাইয়া আনি।" তাঁহার বই তাঁহাকে দেব, ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু আমি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে রসিদ দিয়া বই আনিয়াছিলাম—তাঁহাকে একখানি রসিদ দিয়া বই নিতে বলিলাম। কি ভাগ্য এই রসিদ আমি লইয়াছিলাম! যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া রসিদ লিখিয়া দিলেন—কিন্তু নামের একটা অংশ রূপান্তর করিলেন,তাহা আমি তখন ধরিতে পারি নাই—"নাথের" জাগায় বোধ হয় "চন্দ্র" করিয়াছিলেন। বই পর দিন ফিরাইয়া দেওয়ার কথা—কিন্তু যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে সেই দিন অন্তর্হিত হইলেন—তারপর আর আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই। দুই তিন দিন পরে নগেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন "শুনিলাম,রামেন্দ্রবাবু দুই শত টাকা মূল্যে যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সাহিত্য পরিষদের জন্য পুঁথিখানি কিনিয়াছেন।" আমি ভাবিলাম, ভট্টাচার্য্য বোধ হয় তাঁহাকে পুথি দিয়া মূল্য লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তথাপি রামেন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখিলাম "বই যদি আপনাকে দিয়া গিয়া থাকে তবে আমাকে ফেরৎ দেবেন,—কারণ এখনও আসল দেখিয়া নকল মিলানো হয় নাই।" এই পত্র পাওয়া মাত্র রামেন্দ্রবাবু জ্বর গায়ে গাড়ী করিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"আপনি কেন বই দিলেন? সে আমার নিকট হইতে দুই শত টাকা লইয়া গিয়াছে, আপনার কাছে বই আছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা দিয়াছি।" আমি তাঁহাকে রসিদখানি দিলাম, তাঁহাকেও ভট্টাচার্য্য আর একখানি দুই শত টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিয়াছেন সে রসিদ তিনি আমাকে দেখাইলেন। আমি বলিলাম "আপনি এই

যে কারবারটা করিলেন, ঘুণাক্ষরে তাহা আমাকে জানিতে দিলেন না, অথচ যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে শীঘ্র বই ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া আপনি আমাকে তাগিদ দিতেছিলেন। বইখানি সত্যই ফিরাইয়া দিয়াছি কিনা, তাহা না জানিয়া আপনি আগেই টাকা দিয়া সাফ হইলেন।"

তিনি বলিলেন, "সাহিত্য পরিষৎ হইতে আপনি পুঁথি পাইয়াছেন—সাহিত্য পরিষদে পুঁথি দেবেন—তাহাকে দেওয়ার অধিকার আপনার কিরূপে হইল?" আমি বলিলাম—"পুঁথি তো আর সাহিত্য পরিষদের নহে,—তাঁহারই পুথি, সে যদি দুই এক দিনের জন্য কার্য্যবশতঃ চায়—তবে রসিদ লইয়া দিয়া যে আমি কি অন্যায় করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারি না। এই বইখানির দাম পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল,—তাহা আপনি জানিতেন, অথচ গরীব ব্রাহ্মণকে—কবিকঙ্কণের বংশধরকে—জানিয়া শুনিয়া তিন শত টাকা কমে আপনি একটা রফা করিয়াছেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে একথা কিছু দোষের নহে, কিন্তু আপনার মত লোকের পক্ষে এটা শোভন কহে। সাহিত্য পরিষদের দু পয়সা লাভ দেখাইতে যাইয়া গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষতি করিতে গিয়াছেন, সে আপনার উপর এক কাটি; ফাঁকে পাইয়া জব্দ করিয়াছে।" রামেন্দ্রবাবুর মুখে সে দিন আর হাসি দেখিলাম না; তিনি মাঝে মাঝে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া চক্ষুর তারা উর্দ্ধে উঠাইতেন,—তাহাতে ছদ্মবেশী ক্রোধের অভিনয়টা বেশ কৌতুকাবহ হইত,—এই ভাবে চোখের তারা উর্দ্ধে উঠাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরে লালবাজার পুলিশ কোর্টে যাইয়া সাক্ষীর সমন পাইয়া দেখি, ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তাহার ৯২ বৎসরের মাতাকে সঙ্গে করিয়া উভয়ে মড়ার মতন কোর্টের বারেণ্ডার উপর চোখ উল্টাইয়া পড়িয়াছে; বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের অনুরক্ত,

তাঁহাদের কীর্ত্তি-রক্ষণ-শীল ও পুষ্ঠ-পোষক সাহিত্য পরিষদের হস্তে কবিকঙ্কণের বংশধরের এই লাঞ্ছনা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। আমি ভট্টাচার্য্যকে মিষ্ট কথা বলিতে গেলাম, সে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় অস্ফুট স্বরে বলিল—"আপনি সরিয়া যান্—সাহিত্য পরিষদের লোকগুলি রাক্ষস, আপনারা কি মনস্থ করিয়াছেন, গরীব ব্রাহ্মণ কয়েকটা টাকা লইয়াছিল, ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিলেই ত পারিতেন, কন্যাদায় গ্রস্ত হইয়া দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কাজ করিয়াছি, তাহার ফলে আজ ফৌজদারীতে টানিয়া আনিয়া আমাকে আমার মাতার সহিত বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই বলিয়া সে চোখ বুজিল ও ঘৃণায় আর আমার সঙ্গে কথা বলিল না। আমরা সাক্ষ্য দিলাম, কিন্তু সে যে প্রতারণা করিয়াছে—ইহা সাব্যস্ত হইল না,—জ্ঞাতিরা তাহার হাত হইতে পুঁথি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল—কারণ একা তাহার বই বিক্রয় করিবার কোন অধিকার ছিল না। এইরূপ কোন একটা আকার ধারণ করিয়া মোকদ্দমাটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল ও ভট্টাচার্য্য বেকসুর খালাস পাইল। তাহার বিরুদ্ধে পরিষৎ আর দেওয়ানী করিতে পারেন নাই—কারণ ইহার অল্প পরেই সংবাদ আসিল—ভট্টাচার্য্য শুধু রামেন্দ্রবাবুকে নয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলকে ফাঁকি দিয়া সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে।

রামেন্দ্রবাবুর হাতের লেখা পড়া যাইত না; এইজন্য আমি এক পোষ্ট কার্ডের মধ্য হিজি বিজি লিখিয়া—মাঝে মাঝে তার দুই একটা বর্ণাক্ষর ছিল—চিঠিখানির উপরে urgent লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি গাড়ী করিয়া ঐ পত্র আমাকে দিয়া পড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে সব কথা বলিয়া ফেলিলে তিনি "নির্দ্দহন্নিব চক্ষুষা" অভিনয় করিয়া আমার ভয় অপেক্ষা কৌতুকেরই বেশী উদ্রেক করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার "ত্রিপুরঃ জয়্যাং পূর্ব্বং কন্দর্পোব বক্তৌ

তস্মৈ"এই ভাবদর্শনে আমার ছোট ছোট ছেলেরা ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল।

এই সকল কৌতুক ও আমোদ প্রমোদ যাহা লইয়া শৈশবে মাতুলালয়ে নিত্য ব্যস্ত থাকিতাম—তাহা রোগ অভাব ও নানা ক্লেশের মধ্যে ও আমায় সময় সময় পাইয়া বসিত। একদিন ১লা এপ্রিল উপলক্ষে আমার ভায়রা ভাই রণদা প্রসাদ গুপ্তকে (জুবিলি আর্ট একাডেমির প্রিন্সিপাল) এক আত্মীয়াকে দিয়া আমার বড় মেয়ের নামে এই চিঠি দিলাম—"মেসো মহাশয়, বাবা হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা পড়িয়াছেন" ১লা এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা রণদা ও তাহার স্ত্রী হেমনলিনী দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে দীর্ঘ নিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা শোক সূচনা করিয়া আসা মাত্র আমাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম বাঁচিয়া থাকাটা আমার পক্ষে ভারি অন্যায় হইয়াছে।

এই সময় কলিকাতা প্লেগের উৎপাত হওয়াতে আমি শ্যামপুকুর লেনের বাড়ী ছাড়িয়া লাউডন ষ্ট্রীটে ত্রিপুরার মহারাজার ভাড়াটে বাড়ীতে গেলাম। সেই বাড়ীর ভাড়া মাসিক বার শত টাকা। মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য আমাকে সেই বাড়ীতে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মহারাজার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তখন আমার বাল্য সুহৃদ কর্ণেল মহিমচন্দ্র। অতি উদার চরিত্রের লোক, বাঙ্গলা লিখিতে—সুনিপুন, বেশ কথাগুলি জোটে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যস্ত না থাকিলে মহিম ভাল লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। রাজবাড়ীর লোকদিগের মধ্যে মহারাজ-কুমার নবদ্বীপচন্দ্র ছাড়া আমি এরূপ শিক্ষিত কায়দা দুরস্ত, মনস্বী ব্যক্তি আর দেখি নাই। মহিম আমার চিরউপকারী বন্ধু, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য আমাকে অনেক আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন,—ত্রিপুরার রাজবাড়ীর সঙ্গে আমার চিরকালের একটা কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ-মূলক

সম্বন্ধ আছে। অন্যত্র আমার অভিমান আছে, প্রতিষ্ঠা ও নিজপদমর্য্যাদার জ্ঞান আছে, কিন্তু ত্রিপুর রাজপ্রসাদে আমার প্রাণ বিকাইয়া গিয়াছে—সেখানে বিপদে পড়িয়া সাহায্য চাহিতে ও চাহিয়া সহায়তা না পাইলেও আমি কখনই লজ্জা বোধ করিব না; দুঃখে পড়িলে মহিমের কাঁধে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াও সান্ত্বনা পাইয়া থাকি।

লাউডনষ্ট্রীটের বাড়িতে আসার দুই দিন পরে দেখিলাম, একজন ফিরিঙ্গী খিড়কীর দরজা দিয়া ঢুকিয়া বাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোর তার কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরীটা আঁধার করিয়া ছেলে পেলে শুদ্ধ আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছ নাকি? সে বলিল ত্রিপুর-রাজ তাহাদের প্রায় এক বছরের বিল দেন নাই। আমি বলিলাম "তোমরা যা করিলে, তাতে যে আর কোন কালে বিলের টাকা পাইবে—তাহা মনে হয় না। কারণ রাজা আর ২৩ বছরের মধ্যে যে এ বাড়ীতে আসিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই।" আমি শেষে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, তুমি তারটা জুড়িয়া দিয়া যাও, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি টাকা আদায় করিয়া দিতে পারি কি না। সে খানিকটা নীরব থাকিয়া শেষে তারটা আবার জুড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি মহিমকে লেখা মাত্র বিলের টাকা চলিয়া আসিল। লাউডনষ্ট্রীটের আর এক বিপদ ছিল। চারিদিকে বড় বড় সাহেবের বাড়ি, আমাদের ছেলেদের কেউ কাঁদিয়া উঠিলে প্রতিবাসী সাহেবদের ছেলেরা বন্দুক দেখাইয়া গুলি করিবার ভয় দেখাইত। গুলি করাটা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—কারণ তাহাদের হাত হইতে ফস্‌কিয়া গুলিটা চলিয়া আসিলে অনবধানতার অজুহতে আইন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেবে, শুধু ক্ষুদ্র-জীবী বাঙ্গালী শিশুর প্রাণটা পিতামাতাকে শোকে ভাসাইয়া যে চলিয়া যাইবে তাহা আর ফিরিবে না। ছেলেরা ভয়ে অস্থির হইয়া থাকিত,



ক্ষেত্র চূড়ামণি কথক
(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে)

তাহাদের পিতা মাতার ভরং কম ছিল না ;—ব্যথা, কষ্ট ও শত রকমের যন্ত্রণায় শিশুরা মুখ-ভঙ্গী করিয়া কান্নার অভিনয় করিত—ভয়ে কণ্ঠ হইতে স্বর উত্থিত হইত না। লাউডন ষ্ট্রীটের তৃতীয় বিপদ, নাপিতেরা গোঁপ কামাইয়া আট আনা চাহিত, বড় বড় সাহেবরা তাদের হাতে খেউরি হইয়া টাকাটা পকেট হইতে ফেলাইয়া দিতেন ; আমি এত দর কি করিয়া দিব ? সুতরাং মনে করিলাম মুনি গোঁসাইদের কিংবা ব্রাহ্মদের নকল করিয়া শ্মশ্রু গুম্ফরাজিত মুখশ্রী লইয়া নরসুন্দর-নন্দনদের ফাঁকি দিব।

কিন্তু চতুর্থ বিপদ—সত্য সত্যই একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। প্লেগের ভয়ে গগনবাবুরা যোড়াসাঁকোর বাড়ী ছাড়িয়া লাউডন ষ্ট্রীটের নিকট একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় আসিলেন ; গগনবাবুর বড় ছেলে গুপুর সেই বারে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স ছিল ১৬।১৭, ঠাকুরবংশ সৌন্দর্য্যের খ্যাতিতে সর্ব্বত্র পরিচিত,—এই বংশে ও গুপুর মত সুন্দর ছেলে খুব কম জন্মিয়াছে। গুপুর বিবাহে গগনবাবু বোধ হয় ৫০০০০৲ টাকার বেশী খরচ করিয়াছিলেন। পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সকলকে নানা কারু-কার্য্যে পূর্ণ থালা ও অপরাপর তৈজস পত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। সাহেব-পাড়ায় আসিয়া গুপুর টাইফড্ জ্বর হয়, এবং ৮।১০ দিন পরে তাহার মৃত্যু হয়।

এই অতীব শোকাবহ ঘটনায় গগনবাবুরা যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ দেখিতাম। আমি একদিন বলিলাম,—"আপনারা যদি সান্ত্বনা চান, তবে আমি একজন ভাল কথককে নিযুক্ত করিতে পারি, তাঁহার কথায় আপনারা শান্তি পাইবেন।" সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি যেরূপ তৃণটিকে ও আশ্রয় করিতে হাত বাড়ায়, গগনবাবু এই প্রস্তাবটির সফলতা সম্বন্ধে আস্থা-হীন হইয়া ও ইহাতে রাজী হইলেন। বাড়ীর মেয়েরা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায়

দিলেন। আমি ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণিকে এই ভাবে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। মাথায় মস্তবড় টাক—বিশাল হাঁ, যেন জহ্নু মুণি সমুদ্র গ্রাস করিবেন, বর্ণটি জলোকালীব মত, বিশাল ভুঁড়ি লইয়া চটী পায়ে কথক-প্রবর গামছাখানি দিয়া বারংবার মুখ মুছিতে মুছিতে ব্যাসাসনে, আসিয়া বসিলেন। কিন্তু কথা বলিবার ইহার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল। গগনবাবুদের বাড়ীতে ছেলে বুড়ো সকলে মৌতাত ধরিলেন—সন্ধ্যায় বড় হলঘরটায় ক্ষেত্রচূড়ামণির কালো কাঠ উজ্জ্বলা প্রদান করিয়া ফুলের মালা দুলিতে থাকিত, এবং তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিণীহরণ, বকাসুর বধ প্রভৃতি কত পালা যে বলিয়া যাইতেন, তাহার অবধি ছিল না। তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত, সমীরণ, এবং পদ্মবন যেন চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন—কখনও শ্রোতৃবর্গ অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, কখনও ও হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এরূপ অপরূপ বক্তাকে পাইয়া ধর্ম্মের কথায় পৌরাণিক প্রসঙ্গে মন হইতে শোক ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার বাক্‌ছটায় অঙ্কিত চিত্র হইতে আমি 'ধরা দ্রোণ' 'জড়ভরত' ও 'সতীর' মাল্ মসলা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। প্রায় এক-মাসের মধ্যে গগনবাবুর মন এরূপ লঘু হইয়া গেল, যে যখন ক্ষেত্র-কথক কথা বলিতেন, তখন গগনবাবু লুকাইয়া তাঁহার চেহারা ও ভঙ্গীগুলি আঁকিতেন। এপর্য্যন্ত মতিবাবু ছিলেন তাঁর অঙ্কনের প্রধান লক্ষ্য, এখন হইতে ক্ষেত্রচূড়ামণি এই ক্ষেত্রে মতিবাবুর ভাগী হইলেন। ক্ষেত্র-কথকের উপার্জ্জন ও কম হইত না। বামণভিক্ষা প্রভৃতি পালার বাড়ীর মেয়েরা তাঁহাকে গহনা, মোহর ও টাকা দিতেন,—দুইমাসে তাঁহাকে ভুঁড়ি বাড়িয়া গেল, চেহারার চিকনাই হইল, কালো রংটা শ্যামাভ হইল। তাঁহার উপার্জ্জন দেখিয়া মতিবাবুর ঈর্ষা হইত। তিনি বলি-



শিব কীর্ত্তনীয়া

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত চিত্র হইতে)

তেন, "আপনারা শোনেন নাই—তাই! পেনেটিতে এক কথক আছেন, তিনি যখন কথা বলেন, তখন শ্রোতারা কখনও হাসিতে হাসিতে গড়াগড়ি যান, করুন-রস বর্ণনা স্থানে স্ত্রীলোকেরা মূর্চ্ছা যায়,—পুরুষেরা মাটীতে মাথা খুঁড়িতে থাকে, আপনারা এক ক্ষেত্রকেই চিনিয়াছেন ভারি তো চূড়ামণি!" তখনই সেই পেনেটির কথককে আনা হইল, তিনি কিছু মাত্র জমাইতে পারিলেন না। কিন্তু মতিবাবু দমিবার ছেলে নন—বলিলেন, "বামুণ বুড়া হয়ে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে, সেরূপ আর শ... নাই। কিন্তু বেনেটোলায় এক কথক এসেছেন, তিনি নাকি পুত্রশো...ক ও হাসাইতে পারেন।" আসিলেন সেই বেনেটোলার কথক কিন্তু ক্ষেত্র-কথকের পায়ের নখের কাছে তিনি দাঁড়াইতে পারিলেন না। এই ভাবে আর ছইমাসের মধ্যে ২৫।২৭ জন কথক মতিবাবু আস্ফালন করিতে করিতে লইয়া আসিলেন,—কিন্তু ক্ষেত্রকথক কলিকাতার কথকমণ্ডলীর চূড়ার কৌস্তুভমণি হইয়া রহিলেন, তাঁহার আসন কেউ টলাইতে পারিলেন না। একমাত্র শ্যামবাজারের কৃষ্ণকথক ক্ষেত্র চূড়ামণির প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। কিন্তু তিনি নানাকারণে আমাদের আহ্বানে প্রতিদ্বন্দীতার ক্ষেত্রে কথকতার পরীক্ষা দিতে রাজি হইলেন না।

ইহার মধ্যে রবীন্দ্রবাবু গগনবাবুকে কুষ্ঠিয়া-নিবাসী শিবুকীর্ত্তনিয়ার কথা বলিলেন। শিবু আসিল। তিনি, ভিডি, ভিসি, আমি আসিলাম, আমি দেখিলাম, আমি জয় করিলাম। প্রথম দিন গোষ্ঠ গাহিয়াই সে সভা মাৎ করিয়া দিল, আর কি কথকতা দাঁড়াইতে পারে? তাবৎ একতারা যে পর্য্যন্ত বীণা না আসিয়াছে, তাবৎ মল্লিকার বাস যে পর্য্যন্ত গোলাপ তাহার মাদকতা লইয়া না ছুটিয়াছে। মনোহরসাহী একটানে কথকতা উড়াইয়া লইয়া গেল। শিবু গুন্দা-হাতির মত হাত নাড়িয়া ব্যাজোক্তি করিতে পারিত, শুধু গুন্ গুন্ করিয়া ভ্রমরের মত বিলাপের সুরে গুঞ্জন

করিতে পারিত,—প্রেমের উচ্ছ্বাসে পাগলের মত প্রলাপ বকিয়া শ্রোতাকে পাগল করিতে পারিত। সে হঠাৎ গাইতে গাইতে গান অসমাপ্ত রাখিয়া শুধু হাতের ভঙ্গী দিয়া বাকী টুকু বুঝাইয়া দিত, তার চেহারাটা ছিল ক্ষুদ্র একটা হাতীর মত, হাতী যেমন শুঁড় দোলাইয়া বাঁশীর সুরে নাচিতে থাকে, শিবু সেইরূপ ভূড়ি দোলাইয়া হাত প্রসারণ করিয়া যে কত ভঙ্গীতে শ্রোতার মন ভুলাইত তাহা আর কি বলিব! শিশুর দল হইতে সুরু করিয়া বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার গান শুনিয়া কাঁদিতেন।

একদিন রবীন্দ্রবাবু বলিলেন, "শিবু তুমি তো খুব ওস্তাদ, তোমার পূর্ব্বরাগ, মাথুর এগুলি না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ব্রাহ্ম-মেয়েরা থাকবেন— তুমি 'খণ্ডিতা'র পদ গাইবে কিরূপে? দেখ যেন হাটে হাঁড়ি না ভাঙ্গে।" শিবু জোড়হাত করিয়া বলিল "হুজুর শুনবেন, এসকল আমাদের ভক্তির কথা—এতে কি কোন দোষের কারণ থাকতে পারে?"

সেই দিন শিবু খণ্ডিতার পালা গাহিল। প্রথমেই আসরে আসিয়া শিবু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইল, গানে গ বুঝাইল, যাহারা আত্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত তাহারা প্রেম—নির্ম্মল ভগবৎপ্রেম বোঝে না। কিন্তু ভগবান কি তাই বলিয়া তাহাকে কি ছাড়িয়া দেন? কামুক ভগবানের বুকে নখাঘাত করে—তাঁহাকে আঁচড়াইয়া কামড়িয়া দেয়—তবু দয়ার আধার ভগবান তাঁহার কাছে যান। প্রেমিক দুঃখ করিয়া বলেন, "তোমার জীব তোমাকে কত কষ্ট দিতেছে!" এই কথা গুলি শিবু এমন চমৎকার করিয়া বুঝাইল যে ভগবানের অসীম দয়ার রাজ্য—এবং তাহাতে পাপীকৃত অপরাধের চিত্র যেন স্পষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গকে এক উর্দ্ধতন রাজ্যে লইয়া গেল, তার পর যখন সেই ব্যাখ্যার আলোকে সে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নখাহত, দংশিত কৃষ্ণের শ্যামলরূপ

আঁকিয়া দেখাইল, তখন কোন অপবিত্রতার লেশ সেই সকল পদে স্পর্শিল না,—সমস্তই যেন মনকে এক ঊর্দ্ধ-রাজ্যের স্বর্গীয় সংগীতের ঝঙ্কারে মাতাইয়া তুলিল।

ক্ষেত্র-চূড়ামণির পশার শিবু আসিয়া এই ভাবে মাটী করিয়া দিয়া গেল। ক্ষেত্র কথক আমার নিকট প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "তাই তো দীনেশ বাবু, শিবু এসে আমার বাঁধা আসরটা নষ্ট করিয়া দিয়ে গেল।"

আজ শিবুও নাই, ক্ষেত্রকথক ও নাই, কিন্তু গগনবাবুর পুরাতন চিত্র-খাতায় ইহাদের ছবি নানা ভঙ্গীতে আঁকা আছে, তাহা একটা দেখিবার জিনিষ বটে।

একদিন চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে আমি দুটি জিনিষ ভালবাসি, হোমিওপ্যাথী ও মনোহর সাই গান।"

শিবুর পরে আমি গণেশের কীর্ত্তন শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস গণেশের কীর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছেন। গণেশ বেশ গায়—বিশিষ্ট লোকের আসরে গণেশ গাহিবার যোগ্য। সুরটি মেয়েদের মত মিষ্ট,—ভাবও বেশ খাগাইতে পারে। কিন্তু শিবুর ভাব, ভঙ্গী ও উন্মাদনা গণেশের নাই, গণেশ অনেকটা সভ্য-রকমের গায়ক। কিন্তু কীর্ত্তন গায়কের রাজা গৌর দাস। গৌরদাস রাত্রি ৯টায় জপ করিতে বসে, রাত্রি তিনটায় জপ শেষ হয়—সমস্ত সময়ই প্রায় কাঁদিতে থাকে,—পার্শ্বে তাহার যুবতী স্ত্রী ঘুমাইয়া থাকে, শুনিয়াছি গৌরদাস তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত ও করে না। তাহার জপমালা একটা গোখরা-সাপের মত, এত বড় তুলসীর মালা আমি দেখি নাই; সে থলি হইতে সেটি বাহির করিলে ছেলেরা ভয় পায়, ঐ জপ-মালাটা গৌরদাসের প্রাণ, সে নিঃসন্তান। আমি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি-

দিগকে কি করিয়া বুঝাইব যে ঐ জপমালা গৌরদাসের সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতি সকলের স্থান পূরণ করিয়াছে। তার চেহারাটা দাঁড় কাকের মত, কথা-বার্ত্তায় কতকটা পাগলের মত—সে আসিয়া হয়ত আমার সোনার চস্‌মাটা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, না হয় আমার আলোয়ান খানা লইয়া নিজে গায় দিয়া হাসিতে লাগিয়া গেল। এদিকে সে এতবড় হিসাবী, যে আসরে যদিও একচ্ছত্র সম্রাট, তথাপি গান গাহিয়া যাহা পায় দলের লোকেরা হয়ত সবটাই ফাঁকি দিয়া লইয়া যায়—গৌরদাসের হয়ত অন্ন জোটে না।

কিন্তু এসকল সত্ত্বেও এই গৌরদাসের মত লোককে যে দিন শিক্ষিত সমাজ চিনিবে, সেই দিন তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। বড় বড় ইংরেজী পুস্তকের গৎ আওড়াইয়া চম্‌কাইয়া দেওয়ার যুগ চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের সভ্যতায় সার—যাহা ৭।৮ হাজার বছর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে,তাহার কতক কতক বৈষ্ণবদিগের সহজ-সম্প্রদায়ের পুস্তকে আছে। বটতলা কিছু কিছু ছাপাইয়া রাখিয়াছে। যাহাকে আমরা নিম্নশ্রেণী বলি, তাহারাই এই পুস্তক গুলির পাঠক। মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি তন্ত্রের ভিতর দিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া কিরূপ অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, যাহা শুনিলে যুরপীয় দার্শনিকের বিস্ময় জন্মিবে, তাহার বোদ্ধা আমাদের জন-সাধারণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও তাহার খবর পান নাই, অনেক সময় সেগুলি সম্প্রদায়-বিশেষের পারিভাষিক শব্দপূর্ণ, সে ভাষার নাম 'সন্ধ্যাভাষা' তাহা অপরের দুর্ব্বোধ্য। গৌরদাস যখন গান গায় তখন চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়। বহু কথা যাহা আজীবন বৈষ্ণবপদ ঘাটিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই—গৌরদাস গান গাহিয়া তাহা আমাকে বুঝাইয়াছে। পদাবলীর টীকা হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসাদির যে টীকা রাধামোহন ঠাকুর সংস্কৃতে পদামৃত সমুদ্রে করিয়াছেন—তাহা হইতে উৎকৃষ্ট টীকা গায়কেরা

করিয়াছেন, তাহা গানে গানে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে—সেই টীকার নাম আখর। গৌরদাস এই আখরের রাজা; সে যখন গোষ্ঠ গানকরে, তখন যেন কোন যাদু কাটির স্পর্শে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সজীব হইয়া আসরে উপস্থিত হন। এরূপ অপূর্ব্ব হইতে অপূর্ব্ব কিছু আমি শুনি নাই। কালিদাস, বাল্মীকিকে হার মানাইয়া দেয় এই কীর্ত্তন। সেই কালো, কঙ্কালসার, রেখাগ্রস্ত কপাল, একান্ত নিরীহ, ব্যক্তি যখন আসরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন যেন দেবী ভারতী স্বয়ং বীণা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ান। কীর্ত্তন শুধু গান নহে, ইহা উপনিষদের সময় হইতে বৌদ্ধ জগতের মধ্যদিয়া ভারতীয় যত ধর্ম্মমত হইয়াছে তাহার হৃদয়গ্রাহী সরল ব্যাখ্যা,তাহা সমস্ত ধর্ম্মের প্রাণ—হিন্দুসভ্যতার রাগ-রাগিনীতে মুর্ত্তিমান প্রকাশ। গৌরদাস পাগল, হাতে তালি ও বাহাবার চোটে সে হয়ত বক্তৃতা আরব্ধ করিয়া দিল, তখন গান মাটি হইয়া গেল। তেজস্বী ঘোড়ার যেরূপ রাস ধরিয়া রাখা চাই,—গৌরদাসকে সেই রূপে গানের মধ্যেই রাখিয়া দেওয়ার চেষ্টা দরকার। ইতর শ্রেণীর শ্রোতারা ব্যাখ্যা শুনিয়া হাতে তালি দিয়া গৌরদাসকে বিপথে লইয়া গিয়া তাহার গান মাটি করিয়া ফেলে। এই একরূপ নিরক্ষর বৈষ্ণব ভিখারী কেমন করিয়া হিন্দুর দার্শনিক তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম বিষয় গুলি এরূপ মন ভুলানো গানে পরিণত করিয়া ফেলিল—তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। আখর গুলির কতক সে পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ আখর সে জপের নিকট পাইয়াছে—কৃষ্ণ-ভক্তিতে ভরপুর তাঁহার স্বীয় নয়নাশ্রুর নিকট পাইয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের পদ পাইলে তাহার মনের বীণা ঝংকার দিয়া বাজিয়া উঠে, তাহার আখর গুলি সেই ঝঙ্কার হইতে উৎপন্ন। সে আসরে একাই একশ। শিবু, গণেশ তাহার ছাত্র হইবার যোগ্য। তাহার খোলের হাত এত দুরন্ত, যে সে যখন খোলওয়ালার ব্যর্থতায় চটিয়া গিয়া শিখাটা

দোলাইতে দোলাইতে খোলে চাটি দেয়, তখন খোল যেন মানুষের ভাষা শিখিয়া কথা বলিতে থাকে।

আমাদের সকল বাণী-প্রিয় দেশ গৌরদাসের মত ব্যক্তিকে চিনিল না। আমাদের ঘরের কাছে নিরন্ন গায়ক খোল-করতাল-মন্দিরার সঙ্গে হিন্দুর সুপ্রসিদ্ধ অথচ চির জীবন্ত, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সরস, অতি-দার্শনিক হইয়া অতি মধুর, সারগর্ভ অথচ সকরুণ—যে শিক্ষা বেদ বেদান্তের সার, যাহা চৈতন্য জীবনের সাক্ষাৎ প্রকাশ, চরিতামৃতের মর্ম্ম—তাহা বুঝাইতে চাহিয়া দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ চাহিতেছে, আমরা বিদেশী শিক্ষার মোহে নেংটী পরা ভিখারী মনে করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি। এইরূপে আমরা আমাদের দেশ-লক্ষ্মীকে পদে পদে অপমান করিতেছি। আমাদের আঙ্গিনা হইতে সেই লক্ষ্মীর অলক্তক রাগরঞ্জিত পায়ের ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া কতকগুলি বিলাতী কচু টবে সাজাইয়া রাখিয়া "আমার দেশ" গান ধরিয়া বিলাতী সুরে বিষম চীৎকার করিতেছি—এই আমাদের দেশ-হিতৈষিতা ও স্বদেশ-ভক্তি।

আমাদের সঙ্গে অপরাপর দেশের তফাৎ এইখানে—আমাদের কুশিক্ষার ঘুর্ণচক্রে—দেশের যাহা বড় তাহা ছোট হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর কুকুর হইয়াছে, যাহা কিছু নগন্য, ক্ষুদ্র -তাহাই দীর্ঘ তালতরুবৎ আকাশ স্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে। আমরা রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া ভুবালকে লইয়া বড়াই করিতে শিখিয়াছি।

আমি আর একটি কীর্ত্তন-গায়কের নাম করিব, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সঞ্জীব চন্দ্রের পুত্র—জ্যোতিশ্চন্দ্র। জ্যোতিশের ভক্তি এতবড় যে কীর্ত্তন গাহিতে যাইয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হন, তাঁহার ভক্তিপূর্ণ আবেগ ও মন ভুলানো কীর্ত্তনগানে শ্রোতৃবর্গ মাতিয়া উঠে। তিনি পুলিসের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। বীরভূমিতে থাকা কালীন তিনি ময়নাডাল প্রভৃতি

328



শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ।

স্থান হইতে কীর্ত্তন শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব-পদে মস্‌গুল হইয়া আছেন, কাহারও কীর্ত্তন শুনিতে যান না, কেবল গৌরদাসের নাম শুনিলে উন্মত্ত হইয়া রাতদিন গ্রাহ্য না করিয়া ছুটিয়া যান। গৌরদাসের বাড়ী নবদ্বীপ বঙ্গ-পাড়ায়। কিন্তু সে কলিকাতায় শ্যাম-বাজার কাণা-রাজার বাগানে সস্ত্রীক বাস করিতেছে।

এদেশের এই রীতি যে মহা-কবি যে কাব্য রচনা করিয়া গেলেন, তাঁহার ভাব সাধরণ্যে বুঝাইতে গায়কেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়, এইভাবে চণ্ডীমঙ্গল, রামমঙ্গলের উৎপত্তি। দেশেটা এই ভাবে একটা কাব্যের জগৎ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বাল্মীকি ধূর্জ্জটির জটাবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই—সেক্ষপীয়রাদিকে ইংরেজজাতি একরূপ শেল্‌ফে তুলিয়া রাখিয়াছেন, কচিৎ কোন পরিশ্রমী পাঠক তাহার পাতা উল্টাইয়া গবেষণা করিয়া থাকেন, কিন্তু গায়কেরা আমাদের দেশে ভগীরথের মত পল্লীর দুয়ারে দুয়ারে কাব্যগঙ্গাকে বহাইয়া দেন। সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুর প্রাণ-ভাণ্ডা-রের অমূল্য হীরামাণিক লইয়া গৃহে গৃহে হরিলুট দিতেছেন, কীর্ত্তণ গায়কেরা। এই সকল চিরন্তনী মহাশক্তি, যাহা আমাদের সামাজিক জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যাহার অপর্য্যাপ্ত মহাদানে এই সমাজ সরস হইয়াছিল, যাহা হইতে কাব্য-ভাবের পুষ্পবৃষ্টি নিরন্তর হইয়াছে, শিক্ষাভিমানীর অব-হেলা ও তাচ্ছল্যে তাহার মূল পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—এইরূপ গায়ক-সৃষ্ট,সার্ব্বজনিনী শিক্ষা—সভ্যতার বিস্তার—প্রায় আর পৃথিবীর কোন স্থানে নাই। জাতীয় শিক্ষার এই মুকুটমণি কি খসিয়া পড়িবে? ইঁহারা কাব্যগুলিকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বকালের করিয়া রাখিয়া-ছেন—চৈতন্য প্রভুর শ্রীমুখ আরতির পঞ্চ-প্রদীপে আলোকিত করিয়া দেখাইয়াছেন,—আজ জাতীয় শিক্ষা কি ইহাদিগকে বাদ দিয়া সফলতার চেষ্টা করিবে?

বাড়ীতে এই সময় সকলেরই অসুখ চলিতেছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেও যে আমি খুব ভাল শোধরাইতে পারিয়াছিলাম, তাহা নহে। যদি ও চলিতে ফিরিতে শক্তি হইয়াছিল, সে শক্তি হঠাৎ পাইতাম, আবার হঠাৎ খোওয়াইয়া বসিতাম। এমন মাস যায় নাই, যাহাতে অন্ততঃ সাত আট দিন একবারে সামর্থ্যশূন্য হইয়া বিছানায় পড়িয়া না রহিয়াছি—কোন কোন মাসের প্রায় সব কটা দিনই রোগের শয্যায় শুইয়া—জানেলা পথে রাস্তা দিয়া লোকের আনাগোনা, গো,-শকট—অশ্ব-শকট-চালকের বিচিত্র মুখভঙ্গী ও মূক পশুর উপর কষাঘাত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, পাল্কী-বাহকের দুর্বোধ্য সমস্বরে উচ্চারিত উড়িয়া বুলি ও তালে তালে পা ফেলা —নিতান্ত কৌতুকাবহ ব্যাপারের ন্যায় লক্ষ্য করিয়াছি। যখন খুব ভাল থাকিতাম, তখনও এক মাইলের বেশী হাঁটিতে পারিতাম না। এই সময় আমার কন্যা ব্রজবালা-দেবীর মৃত্যু হয়—সে দশ বছরে পা দিয়াছিল; আমি আমার ছেলে মেয়েদের একটা কণ্ডাক্ট-রেজিষ্টার করিয়াছিলাম—তাহাতে সে প্রায়ই প্রথম থাকিত। সে ছিল শ্যামাঙ্গী, কিন্তু এরূপ মৃদু-স্বভাবের মেয়ে, সেরূপ ভীরু প্রায় দেখা যায় না; সে একা ঘরে থাকিলে নিজের একটা ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিত,—তাই ভাবি—যে আঁধার রাজ্যের নামে বড় বড় বীর আতঙ্কিত হয়—সেই রাজ্যে এই ভীরু শিশু একা কেমন করিয়া থাকিবে? সে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে থাকিত, নিজের স্নেহশীল কচি হাত দুখানি দিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত করিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে আমাকে হাওয়া করিত—আমার বস্ত্রাদি সাজাইয়া রাখিত। তাঁহার জন্য কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার পিতৃদেব নিঃস্বার্থভাবে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই দুই মহারথী প্রাণপণে যম-রাজের সঙ্গে জুঝিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। ৪৯ দিন জ্বরে ভুগিয়া এক মঙ্গলবার

অপরাহ্নে সে চলিয়া গেল—প্রাণ-ত্যাগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তাহার মায়ের দিকে স্নেহনির্ভরশীল পরম করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, সেই দৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত আমাদের বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে। সে নিবেদিতার স্কুলে পড়িত—তাহার আঁকা ছবি, এবং লেখার খাতা নিবেদিতা একখানি সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি লিখিয়া আমায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সে টাইফড জ্বরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এক ঘরে যখন সে নিদারুণ জ্বরে ইহসংসারের দ্বার ডিঙ্গাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল—তখন অন্য ঘরে পাঁচ বৎসরের ছেলে বিনয় সেই ক্রূর টাইফড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পিতামাতার বিরল-সঙ্গের জন্য হাঁপাইতেছিল—উৎকট অবস্থায় ব্রজবালাকে ছাড়িয়া আমরা তাহার প্রতি মনোযোগী হইতে পারি নাই। তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া বিনয়ের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলাম। কবিরাজ মহাশয় আর্ত্ত কণ্ঠে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যাঁহাকে ধন্বন্তরী জ্ঞানে চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম,—তাঁহার উপর সেরূপ বিশ্বাস আর রাখিতে পারিলাম না। রাত্রে বিনয়ের অবস্থা এমন হইল যে সে রাত্রিই তাহাকে রাখা যায় কিনা—সন্দেহের স্থল হইল; পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কৃষ্ণবাবু দেখিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার নিকট হইতে বারংবার ঔষধ আনিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাত্রিকালে রোগী দেখেন না বলিয়া আসিতে রাজী হইলেন না। সে নিদারুণ রাত্র কোনক্রমে কাটিয়া গেল; পর দিন প্রত্যূষে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, বাড়ীর দ্বারদেশে একটি ক্ষুদ্র ঘট দেখিয়া অশ্রুতে মুখ ভাসিয়া গেল, সেই ঘটরূপে—মৃত শিশু যেন আমার গৃহে তাহার শোক-স্মৃতি রাখিয়া গেছে, পার্শ্বে একটা গলির মধ্যে দেখিলাম তার শয্যা,—আমার পা যেন আর চলিতে চায় না। চোখের জল মুছিতে মুছিতে বড় রাস্তার বাহির হইয়া দেখিলাম, মিউনিসিপালিটি রাস্তার গাছ গুলির

বড় বড় ডাল কাটিয়া ছাটিয়া দিয়াছেন। নিতান্ত পরিচিত পথ অপরিচিতের মত বোধ হইল, জনপূর্ণ পথ শূন্য মনে হইল। চন্দ্রশেখরবাবুর বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম, তিনি রোগীর আহ্বানে মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছেন। আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল; মনে হইল যেন ভগবান সব দিক হতে আমায় ছাড়িয়া দিলেন, তখন চিরদিন যাহা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তাহাই করিলাম "তুমি ছাড়িয়া দিতে পার, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলে কি লইয়া থাকিব?" এই ভাবে নির্ভর করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম মনে মনে আকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখি, ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র সতীশ ঘরাট ডাক্তার মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। এখন সতীশবাবু কলিকাতার উত্তর ভাগের একজন নামজাদা ডাক্তার, কিন্তু তখনও তিনি ফুটিয়া উঠেন নাই। আমি গিরীশকে বলিলাম, "ইঁহার উপর এই সঙ্গীন রোগীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি কি?" সতীশ বলিলেন "আমি এখন ঔষধ দিচ্ছি, এর পরে ডি, এন রায় কি প্রতাপ মজুমদারকে বৈকালে কি কাল আনা যাইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় ১৭ দিন যাবৎ যে জ্বর ১০৫এর নীচে নামে নাই, গত রাত্রে যে রোগীর ৫০।৬০ বার রক্ত দাস্ত হইয়াছে, এক মাত্রা ঔষধ সেবনে জ্বর ১০২ ডিগ্রিতে নামিয়া আসিল, এবং পেট ও অনেক ভাল হইল। তারপর দিন শ্যাম-পুকুরের বাড়ী ছাড়িয়া শিশু-বিনয়কে অতি সাবধানে পাল্কীতে চড়াইয়া ফড়িয়াপুকুরের এক নূতন বড় রকমের ভাড়াটে বাটীতে লইয়া আসিলাম, তখন ইহার ভাড়া ছিল ৩৫৲ টাকা; এখন বোধ হয় ১২০৲ টাকা হইয়াছে।

সতীশের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়াতে তাঁহারই উপর চিকিৎসার ভার রহিল। কিন্তু ২।৪ দিন পরে ভয়ানক বিভীষিকা দেখিলাম। আমার স্ত্রীর কলেরা হইল, এবং আমার চতুর্থ পুত্র বিনোদ (তখন

২২ বৎসর বয়স্ক,) হারাইয়া গেল, এদিকে নানা উদ্বেগে নিজ হাতে ষ্টোভে বার্লি জ্বাল দিতে যাইয়া স্পিরিটের আগুনে রুগ্ন শিশু বিনয়ের মাথার চুল পোড়াইয়া ফেলিলাম ও আমার হাত পুড়িয়া গেল। বিনোদের জন্য হেম-গিরীশ, প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ খুঁজিয়া হয়রাণ হইল। আমি শয্যাগত হইয়া পড়িলাম, কে দেয় পথ্য, কে দেয় ঔষধ? স্ত্রীর অবস্থা খারাপ হইতে চলিল,—এক মাত্র ভৃত্যটিকে গিরীশচন্দ্র প্রহার করাতে সে পলাইয়া গেল,—এই একটা দিন চির-জীবনের স্মরণীয়। যখন বিপদ আসে—তখন তাহা শিলাবৃষ্টির মত আইসে। আমি নিরুপায় হইয়া কর্ণধারকে হাল ছাড়িয়া দিলাম—"মাঝি তোর বেঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারি না।"

দুশ্চিন্তায় ও শোকে আমার স্ত্রী এতদূর অন্য-মনস্কা হইলেন, যে তাঁহার কলেরা সারিয়া যাইবার মধ্যে হইল; সতীশকে ছোট ভাইয়ের মত কাছে কাছে পাইয়াছিলাম, বিপদের দিন মনে হইতে যেরূপ কষ্ট হয়—বিপদের সময়ের বান্ধবতার স্মৃতি আবার তেমনই মহার্ঘ্য। পুলিসে খবর গেল, নানারূপ সন্ধান হইতে লাগিল, ছয় সাত ঘণ্টার পর সন্ধ্যাকালে নিকারি পাড়ার ভোলা মিস্ত্রি বিনোদকে কোলে করিয়া উপস্থিত হইল। আমি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভোলাকে আলিঙ্গন দিলাম। আমার স্ত্রী আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। ভোলা মিস্ত্রি আমার বাড়ী তৈয়ারী করিতেছিল, সে বিনোদকে চিনিত। সে সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাইল, শিশু একটা ছড়ি হাতে নিকারী-পাড়ায় এক মুসলমানের বাড়ীর ঘরের দেয়ালে গা ঠেকাইয়া কাঁদিতেছে এবং অনেক লোক তাকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছে,—কিন্তু তাহার কান্না বোঝা যাইতেছে—কথা বোঝা যাইতেছে না, আড়াই বছরের ছেলের ভাষার অর্থ কোন অভিধানেও থাকায় কথা নহে।

সতীশের চিকিৎসার ছয় মাস পরে বিনয় সারিয়া উঠিল। তারপর শ্রীচন্দ্রের ও সুধীরচন্দ্রকে সেই পীড়া আক্রমণ করিল। অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে সতীশ তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আমাকে ফেরৎ দিয়াছেন। টাইফড রোগ চিকিৎসায় তাঁহার মত কৃতী চিকিৎসক আমি দেখি নাই। আমার বাড়ী ছাড়াও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বাড়ীতে ও সতীশ সেইরূপ আশ্চর্য্যজনক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—শ্মশান-যাত্রীকে মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বিচারপতি মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে সামাজিক আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। নগেন্দ্র বাবু 'কায়স্থ কারিকা' লিখিলেন এবং তিনি এই আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ হইলেন। বিষয় সংক্রান্ত তাবৎ ব্যাপারে তাহার মত বোদ্ধা আমি খুব কম লোকই দেখিয়াছি, তথাপি আমার কথার উপর কেন জানি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, তিনি সকল বিষয়েই আমার পরামর্শ লইয়া চলিতেন।

তিনি উপবীত গ্রহণ করিবেন কিনা এই লইয়া দোমনা ছিলেন। আমার পীড়াপীড়িতে শেষে পৈতা গ্রহণ করা ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ-সমাজে আমি এজন্য নিন্দিত হইব, আমি জানিতাম। কিন্তু যখন কেহ তাঁহার শুভ পথ কি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা নিজকে অন্ধ করিয়া বন্ধুকে অশুভ পন্থা দেখাইতে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মণদের অনেকে যে এক সময় পৈতা সর্ব্বদা গলায় পরিতেন না, তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্ট পাইয়াছি। এই নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই একজন নেপালবাসী করাতী একবার কাঠ চিরিতে ছিল, সে খুব লোভনীয় বড় বড় রুটি তৈরী করিত। আমি তাঁহাকে আমার জন্য সেইরূপ কয়েকখানি রুটি তৈরি করিতে

বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমারা কোন জাত?" সে বলিল "ব্রাহ্মণ", আমি তার পৈতা দেখিতে চাহিলে সে বলিল, "আমার পৈতা নাই, আমি কাঠ চেরার কাজ করি, আমার পৈতায় কি দরকার,? আমার কনিষ্ঠ সহোদর যজন যাজন করে—তার গলায় পৈতা আছে।" একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই কথায় আমার নিকট প্রকাশিত হইল। যদিও ক্ষুদ্র হউক এই পৈতাটার ভার দিনরাত্রি কাঁধে করিয়া রাখিবার দরকার কিছু ছিল না, দরকার না হইলে মানুষ একটা বাহুল্যের প্রশ্রয় দেয় না। পৈতার নাম যজ্ঞোপবীত। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের সময় যজন যাজন উপলক্ষেও যজ্ঞের জন্য এই ধর্ম্মচিহ্নের ব্যবহার হইত। যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহাদের পৈতা সর্ব্বদা গলায় রাখার দরকার হইত—কিন্তু অপরাপর ব্রাহ্মণেরা সময়ে এই চিহ্ন ধারণ করিতেন, সময়ে ছাড়িয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ব্রাহ্মণ জাতিকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র-গৌরবে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করিবার পর, ব্রাহ্মণমাত্রেরই উহা এদেশে অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের পৈতা সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। এজন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যে একসময় পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, "তাহা পৈতা ছাড়ি পৈতা লয়—বৈদিকে দেয় পাতি" এই পরিচিত প্রবাদ বাক্যে পাওয়া যাইতেছে। বিজয়গুপ্তের মনসাদেবীর ভাসানে মুসলমানকৃত অত্যাচার বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে "বাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাঁধে। প্যায়দাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।" ইহা দ্বারা দেখা যায় যে তাহারা শুধু সেই সকল ব্রাহ্মণকে ধরিয়াছিল, যাহাদের গলায় পৈতা ছিল। সুতরাং সকল ব্রাহ্মণের গলায় পৈতা ছিল না। মানিক চন্দ্ররাজার গানে দৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ রাজসভায় আহুত হইলে উত্তরীয়ের ন্যায় পৈতাগাছা ও পরিতেন, তাহা তাঁহার গল-লগ্ন থাকিত না। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যাইতেছে, চৈতন্যপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণের

প্রাক্কালে স্বীয় পৈতাগাছা কণ্ঠ হইতে তুলিয়া তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ উপহার দিয়া গেলেন। সুতরাং পৈতা, ছাড়া, আর ধরা—এটা শুধু সামাজিক ব্যাপার। আমি নগেনবাবুকে বলিলাম, "শুনিয়াছি, উত্তর পশ্চিমের লালাকায়েতেরা আপনাদিগকে কায়েৎ বলিয়া স্বীকার করেন না। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতিকে তাহারা ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড জাতিগুলি যদি এক হইতে পারে—সেটাও যে জাতীয় ঐক্যের পথে একটা মস্ত বড় লাভ। যদি উপবীত গ্রহণ করিলে লালাকায়েতেরা আপনাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করেন—তবে সংখ্যাবলে আপনারা বলীয়ান হইয়া উঠিবেন। আমাদের এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন সমাজের কোন এক শ্রেণী যদি এই ভাবে বড় হয়—তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। দ্বিতীয়তঃ কে কোন জাতি কে জানে? সমাজে বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য ব্রাহ্মণের শিরার রক্ত পরীক্ষা করিলে উহা অবিমিশ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। যখন আদম হাল চষিতেন এবং হেবা তাঁত বুনিতেন, তখন কে ছিল ব্রাহ্মণ আর কে ছিল শূদ্র! কিন্তু এখন যদি আপনারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন—তবে শুধু নামটির জোরে ক্ষাত্রতেজ আপনাদের সমাজদেহে কিছু না কিছু সঞ্চারিত হইবে, এবং আচার শুদ্ধতার দিকে ও একটা লক্ষ্য পড়িবে—এদিক দিয়াও তো মস্ত বড় লাভ।"

আমার উৎসাহে নগেন্দ্রবাবু উপবীত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঠিক পৈতা দেওয়ার মুখে পুরোহিতেরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পলাইয়া গেলেন। নগেন্দ্র বাবুর সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হইবার মধ্যে আসিল। তাঁহার মুখখানি ভয়ে ও লজ্জায় ছোট হইয়া গেল, দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত হইলাম। আমি রাস্তা হইতে কোটালিপাড়ার বিখ্যাত চৌধুরী বংশোদ্ভব রামকৃষ্ণ-পণ্ডিতকে গামছা জড়াইয়া বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিলাম, এবং যে পর্য্যন্ত

নগেন্দ্রবাবুর উপবীত কার্য্য শেষ না হইল, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে চোখের আড়াল হইতে দেই নাই। তিনি বারংবার পলাইবার জন্য এ দরজা সে দরজায় ঢু মারিতে ছিলেন। এই পৌরহিত্যের দরুণ বৈদ্যদের যাঁহারা যাঁহারা তাঁহাকে প্রণামী দিতেন. তাঁহারা তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ চৌধুরী এইজন্য বৎসর বৎসর আমার নিকট খেসারৎ আদায় না করিয়া ছাড়িতেন না।

ইহার পর অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্রের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুর কন্যার বিবাহ আমিই স্থির করিয়া দেই। অক্ষয়বাবু ছিলেন পৈতা-বিরোধী—আমি তাঁহাকে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া এই বিবাহে সম্মত করাইয়াছিলাম। কিন্তু বিবাহ-বাসরে শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়ের আনীত ব্রাহ্মণেরা নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কিছুতেই খাইবেন না, স্থির করিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইলাম—এতকাল শূদ্রদিগের পৌরহিত্য করিয়া তাঁহারা হীন কাজ করিয়াছেন, এখন কায়স্থেরা যখন ক্ষত্রিয় ও উপবীতধারী হইলেন,—তখন তাঁহারা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী হইয়া পবিত্র হইবেন। ইহাতে তাঁহারা কেন বিরক্ত হইতেছেন? এই সকল কথায় তাঁহারা প্রীত হইয়া নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাইয়া আহারাদি করিলেন।

বৈদ্য-সমাজ আমার উপর বিরক্ত হইলেন, আমি বৈদ্য-সভার সম্পাদক ছিলাম। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি বলিলাম, "আমাদের এই সামাজিক পদ-মর্য্যাদার উদ্ধার কল্পে যে জাতিই যে চেষ্টা করিতেছেন—তাহা তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণকর, পরন্তু সমস্ত হিন্দু সমাজের পক্ষেও তাহা শুভ। আমরা ভাই ভাইয়ের মত পরস্পরকে ধরিয়া তুলিব—কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে আমাদের অনিষ্ট কি? ঈর্ষা-দ্বেষে সমাজ নষ্ট হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্র হইতে যথাসাধ্য কাঁটা তুলিয়া ফেলিব, কাঁটা বনে জল সেচন

করিয়া তাহা পোষণ করিব না। পরস্পরের কপালে পরস্পরে গৌরব-চন্দনের ফোঁটা আঁকিয়া প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইব। আমি এই বিষয়ে অনুকূলতা দেখাইয়া কি অন্যায় করিয়াছি, বুঝাইয়া দিন্।"

কিন্তু ইহার পরে বিশ্বকোষে 'বৈদ্য' শব্দ লইয়া বিদ্বেষপূর্ণ একটা কুৎসাকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ-প্রকাশের প্রায় ছয় মাস পরে উহা আমি প্রথম দেখিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত শুনিলাম, ঐ প্রবন্ধটি আমি লিখিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন। বৈদ্য-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আমাকে কায়স্থদের অনুকূল জানিয়া এমন একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অমূলক কথাও বিশ্বাস করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে ফুল ছড়াইলে প্রতিদানে ফুল পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে কপালে শূল ঘটে, এই পৃথিবী বড় বিষম স্থান।

অক্ষয় সরকার মহাশয়ের সঙ্গে বি, এ পরীক্ষার পরীক্ষকতার সাহচর্য্যে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। বিরাট—বপু, শ্বেত দাড়ী,—যেন মনুষ্য-জগতের পাহাড়-পর্ব্বত, অল্পভাষী,কিন্তু যখন সাহিত্যিক প্রসঙ্গে কথা বলিতেন, তখন দুইটী চক্ষু যেন প্রতিভায় জ্বলিয়া উঠিত। বঙ্কিম-বাবুর প্রিয় বন্ধু ইনি ও চন্দ্রনাথ বসু উভয়ের রচনাই এক সময় বঙ্গ-দর্শন অলঙ্কৃত করিয়াছে। যখন বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগে অন্ধ হইয়া দেশীয় পুঁথিগুলিকে তামাক-পাতার মত অশ্রদ্ধেয় মনে করিত, তখন ইনি ইংরেজী সাহিত্যানুরাগী হইয়া ও ভারতমধ্যে বাঙ্গালা গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন,—ইনি কবির গানের "হাসি হাসি যখন সে আসি বলে। সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে" প্রভৃতি চিত্রের বঙ্গীয় কুল-বধুর সলজ্জ গণ্ডের রক্তিমা আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজী কবিদের কাছে যে বাঙ্গলার কবিওয়ালা শুধু দাঁড়াইতে পারে তাহা নহে, তাঁহাদিগকে এমন বীণার সুর শুনাইয়া দিতে পারে,

যাহা 'বে অফ্ বিস্কে' কিম্বা 'ইংলিশ চানেলের' পারে কখনও বাজে নাই—এই কথা অক্ষয়বাবু সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রবাবু সংস্কৃত-সাহিত্যের দিক দিয়া হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবু সুকোমল চিত্তবৃত্তির খেলা খেলিয়া বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যটি নূতন করিয়া আধুনিক গদ্য-ছন্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আর্য্য-দর্শনের যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রাজ-নীতির ক্ষেত্রে বিদেশী ক্ষাত্র তেজ বাঙ্গলায় আমদানী করিয়া পাশুপত অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। আমি ইহাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। গত যুগ ইহাঁদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য এ যুগের লেখকগণের মধ্যে নাই। ইহাঁদের কাছে বসিলে, কথায় মুগ্ধ হইতে হইত। ইহাঁরা বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন—ইঁহাদের তুলনায় এখনকার লেখকেরা হাল্কা,—সে পাণ্ডিত্য, সে পুরুষোচিত তেজ, সে গাম্ভীর্য্য এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে পাওয়ার আশা বৃথা। তাঁহারা ছিলেন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ইহাঁরা পথ করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাই এখনকার নির্ঝর-নিনাদ ও মৃদুতরঙ্গের গান আমরা শুনিতেছি। চন্দ্রশেখরবাবু একদিন প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লেখার ইতিহাস আমাকে বলিয়াছিলেন। সে যে কি উন্মাদনাময় ইতিহাস। মনে হইয়াছিল যেন বাল্মীকির কাব্য কিংবা নারদের বীণা ধ্বনি শুনিতেছি। কি করিয়া তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের পথে আসিলেন, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরিচিত হইলেন, স্ত্রী-হারা হইয়া আহার নিদ্রাশূন্য বিরহী যক্ষের মত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলেন—সমস্ত বলিয়াছিলেন, তেমন কথার মোহিনী অল্পই শুনিয়াছি। চন্দ্রশেখর-বাবু শুধু নহেন, বঙ্কিম-যুগের প্রায় সকলেই এইরূপ কথা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা, বিস্মিত, স্তব্ধ এবং মুগ্ধ করিতে পারিতেন। একালের লেখকেরা মেয়েলী ছন্দে কথা কহেন, মেয়েলী ঢঙ্গে কোঁকড়াইয়া চুল গ্রীবার উপর

ফেলিয়া দেন,—কথায় চাতুরী ও বাক্‌ছল দ্বারা মনোরঞ্জন করেন—কিন্তু এই নারায়ণী সৈন্যের সুদর্শন চক্রের প্রভাব স্বীকার করিয়া ও সেই গাণ্ডীবীদিগকে মনে পড়ে, যাঁহারা ধনুতে জ্যা আরোপণ করিলে অর্দ্ধ বিশ্ব চমৎকৃত হইত এবং অক্ষৌহিণী সৈন্য শুধু ধনুর টঙ্কারের রব শুনিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইত।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া আমি,কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে অন্ধ কবি হেমচন্দ্রকে দেখিতে গিয়াছিলাম। হেমচন্দ্রের কবিতার প্রতি বাল্যকালে আমাদের যে অনুরাগ ছিল—এখনকার ছেলেদের তাহার কিছুই নাই। শৈশবে মানিকগঞ্জ স্কুলে আমরা তাঁহার"সুদূর পশ্চিমে ছাড়িয়া গান্ধার, ছাড়িয়া পারস্য আরব কান্তার" প্রভৃতি কাব্য আবৃত্তি করিতাম, পূর্ণবাবু মাষ্টারমহাশয় সেগুলি আমাদের তরুণ কণ্ঠে গানের সুরে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। যৌবনে "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" প্রভৃতি পদ্য আওড়াইয়া আমরা নিরাশ প্রণয়ী সাজিয়াছি। কলেজে পড়ার সময় দশমহাবিদ্যার "রে সতী রে সতী, কাঁদিল পশুপতি—পাগল শিব প্রমথেশ" প্রভৃতি ছন্দাত্মক কবিতা লঘু-গুরু মাত্রা ঠিক করিয়া আবৃত্তি-কৌশল দেখাইয়াছি। তারপর কুমিল্লা থাকিতে বরদাচরণ মিত্র মহাশয় উত্তেজিত ও বিস্ময়াভিভূত ভাবে হেমবাবুর 'বৃত্রাসুর-বধ' কাব্যের কবিত্ব ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতেন। তাঁহার মতে 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের মত কাব্য বাঙ্গলায় হয় নাই। মেঘনাদ বধ কাব্যের সঙ্গে তিনি তুলনামূলক সমালোচনা করিতেন, এবং পদে পদে হেম-কবির মহাকাব্যের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতেন। বৃত্রাসুরের গৌরব লঙ্কেশ্বরের নাই, এবং শচীর বিরাট-চিত্রের নিকট প্রমীলা সীতা ও মন্দোদরী হীন-প্রভ,—হেম-কবি অতি অল্প কথায় খুব বড় বড় চিত্র ফলাইতে পারেন, নাট্য-শিল্পের

যে কৌশল তিনি দেখাইয়াছেন, তার নিকট মেঘনাদ-বধ দিবা-প্রদীপবৎ-ম্লান হইয়া গিয়াছে, এই ছিল তাঁহার মত। নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় আমাদের শিক্ষক ছিলেন, তিনি দশ-মহাবিদ্যাকে মানব সমাজের ক্রমোন্নতির আধ্যাত্মিক আলেখ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই বড় বড় সমালোচকগণের মতকে যাঁহার কাব্য এতটা অনুকূল ও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল—তাঁহার কবি-প্রতিভা অবশ্যই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার সামগ্রী।

তখনও সাহিত্যিক জগতের রবি মধ্যাহ্ন-গগনে উদিত হইয়া অপরাপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ করিয়া দেন নাই। তখনও হেমবাবুর যশ ডঙ্কানিনাদে বিঘোষিত হইত, "বিংশতি কোটী মানবের বাস" শুনিলে বঙ্গ-যুবকের শিরায় রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিত।

এই কবিবরকে দেখিতে উৎসুক হইয়া আমি অসুস্থ শরীরে ও এক খানি গাড়ী করিয়া সঙ্গিদ্বয় সহ খিদিরপুর রওনা হইলাম। তখন শীতকাল,বেলা দুইটা,কি তিনটার সময় প্রকাণ্ড বাপীনীর-বিধৌত,মধ্যাহ্ন-রৌদ্র-স্পৃষ্ট মধুর শীতোষ্ণ বায়ু-প্রবাহে সুখানুভব করিয়া একখানি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। পুকুরটির উত্তর পাড়ে বাড়ীটি চিত্র-পটের ন্যায়,—বড় হইলেও বাড়ীখানি যেন অনাদরে শ্রীহীন হইয়া আছে, গৃহ-স্বামীর দৃষ্টি নাই বলিয়াই এই দুর্গতি, বুঝিতে পারিলাম। বেশী লোক জন নাই, আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখের হল-ঘরটি হইতে পুকুরটি বড় সুন্দর দেখাইল, ঘর খানি যেন দক্ষিণানিল উপভোগ করিবার জন্য সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। একটা মলিন টেবিল ও দুই চারি খানি চেয়ার পূর্ব্ব কোণে, এবং হলের অপর প্রান্তে একখানি সামান্য তক্তপোষ, তাহার উপরে তোষক ও চাদর অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা এত মলিন ও ছিন্ন যে

কবি-রাজের চক্ষু থাকিলে তিনি তাহা কখনই ব্যবহার করিতেন না, মনে হইল তাঁহার তো চক্ষু নাই—এবং তাঁহাকে দেখিবার ও কোন চক্ষু নাই।

কবিবর সেই ম্লান শয্যার উপর খাটো একখানি মলিন কাপড় পরিয়া বসিয়া ছিলেন, শ্যামবর্ণ, ঈষৎ স্থূলাকৃতি। সুরেশবাবু মহিমঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ত্রিপুর-রাজের ষ্টেট হইতে কবিবরের জন্য একটা বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছিল, এজন্য তিনি মহিমকে ধন্যবাদ দিলেন, আমার কথা শুনিয়া বলিলেন "এর ও তো আমার মত ২৫৲ টাকার একটা বৃত্তি গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন!" এই বলিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া শেষে বলিলেন, "আপনারা কেন আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "আপনাকে দেখতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া তাহার ঠোঁট দু'খানি কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ কণ্ঠ স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন "কি দেখ্‌তে এসেছেন?" এই বলিয়া আর নিজকে সাম্‌লাইতে পারিলেন না, প্রায় ৫ মিনিট কাল বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ করিতে পারিলাম না। কিন্তু "কি দেখ্‌তে এসেছেন" কম্পিত কণ্ঠের এই উক্তি ও অন্ধ চক্ষুর সেই অজস্র অশ্রু অনেক কথা অতি স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিল,—বুঝিলাম যে তাজমহল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার চূর্ণ বিচূর্ণ প্রস্তর দেখিতে আমরা আসিয়াছি; রাজ-রাজেশ্বর পথের ভিখারীর মত রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাত পাতিয়া মুষ্টি ভিক্ষা লইতেছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি। শীতকালে পত্র-সার শেফালিকাতরুকে দেখিতে আসিয়াছি। সে করুণ কাহিনী কথায় বুঝাইবার নহে, অশ্রুই তাহার একমাত্র ভাষা। সেই অশ্রুতে আমরা সব কথা বুঝিলাম। কবিবরের হৃদয়ের অন্তস্তলের ব্যথা করুণ ভাবে, সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। আমরা ও সাশ্রুনেত্রে গুরু

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর তাঁকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই করুণ দৃশ্য এখনও ভুলিতে পারি নাই, হেম-কবির যত কাব্য পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে তাঁহার জীবনের এই শেষ পত্রের ন্যায় কোনটিই বোধ হয় এত মর্ম্মস্পর্শী নহে।

১৯১০ সনে আমি আবার কর্ম্মঠতা ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। কত যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহা মনে নাই। প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা পাইতাম, প্রধানতঃ তাহাতেই সমস্ত সাংসারিক খরচ পত্র চলিয়া যাইত। প্রতি প্রবন্ধের জন্য ২০৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। নিতান্ত ছোট প্রবন্ধ ১০৲।১২৲ টাকায় ও লিখিয়াছি। দাসী, প্রদীপ, প্রবাসী, বঙ্গ দর্শন, ভারতী, জন্মভূমি, সাহিত্য, বামাবোধিনী প্রভৃতি কত পত্রিকায় যে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা এখন স্মরণ নাই। ভগবান্ যখন আমাকে একটু স্বাস্থ্যের মুখ দেখাইয়াছেন তখন কখনও আমি বসিয়া থাকি নাই।

কুমিল্লায় ১৮৯৬ সনে যখন আমি উৎকট রোগ-শয্যায় পড়িয়াছিলাম, এবং যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রথম প্রকাশিত হয়,—সেই সময় অর্থাৎ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে, আমি রবীন্দ্র বাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিষ বলিয়া আমি অনেক দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মত হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মত মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর-সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া একটি বছর ছিলাম, তখন আমি শয্যাগত, —রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। ফরিদপুর থাকা কালে তিনি তাঁহার 'কণিকা' আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, আমার মন্তব্য সম্বলিত চিঠির উত্তরে বাং ১৩০৭সনের ৩০শে ভাদ্র তারিখে তিনি লিখিয়া-

ছিলেন—"আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরে যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সে জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম। যখন আপনার খবর পাইলাম, তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিল না।" তারপর তিনি আমাকে শিলাইদহ যাইতে আমন্ত্রণ করিয়া চিঠির উপসংহার করিলেন।

এই সময় হইতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আমি যোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। রবিবাবু শ্রেষ্ঠ কবি শ্রেষ্ঠ লেখক; অপরাপর লেখকের কাব্য পড়িলেই তাঁর মধ্যে যাহা ভাল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত লেখা পাঠ করিলেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক জানিবার বাকী থাকে; তিনি রূপ দিয়া চক্ষু ভুলান, "গুণে আঁখি হরে।" কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব, বন্ধুর সহৃদয়তা ও ঋষি তুল্য ধর্ম্ম-ভাব দিয়া মন হরণ করেন,—তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার পর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ ছায়ার ন্যায় মন হইতে চলিয়া যায়, এবং ছবির মত তিনি সমগ্র মনটি দখল করিয়া বসেন। কত দিন আমার ন্যায় শ্রোতার সম্মুখে সারাটি দিন বীণা-নিন্দিত স্বরে তিনি গান গাইয়া কাটাইয়াছেন,—কত দিন সাহিত্য-ধর্ম্ম-সমাজ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে; তিনি নিত্যই নূতন হইয়া দেখা দিয়াছেন! রূপ ছন্দ ও চিত্ত হারী নানা গুণে তিনি আমার মত বহু লোককে ভুলাইয়া রাখিয়া ছিলেন। রবীন্দ্র বাবু ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে কখনই লোক-মতকে গ্রাহ্য করিয়া লন না—ঠাকুর-বাড়ীর সর্ব্বত্র একটা মৃদু-মধুর সৌজন্য আছে, পাছে পরের মনে আঘাত লাগে, এজন্য ঐ বাড়ীর কেহ কোন ভদ্র ব্যক্তির কথার প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু রবিবাবু অতি মিষ্টভাষী হইয়া ও অন্যায় কথার প্রতিবাদী,

যাহা তিনি ভাল বলিয়া মনে করেন না, তাহা তাঁহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জোরে প্রতিবাদ করেন। গল্পচ্ছলে নানা কথা কহিবার সময়ও—তাঁহার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। তাঁহার স্নিগ্ধ শ্লেষ ও বাক্‌চাতুরী অনেকেই টের পাইবেন, যাহাকে ইংরেজীতে pun বলে, তিনি কথাবার্ত্তায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের সেই ধারাটি সর্ব্বদা ব্যবহার-করেন। তাঁহার সম্পাদকতার সময় শৈলেশ তাঁহাকে না জানাইয়া নিজকে সহঃ-সম্পাদক বলিয়া বঙ্গদর্শনের মুখ-পত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম "শৈলেশ ত আপনার সহঃ সম্পাদক হইয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "সহ" নহে "দুঃসহ"। কোন এক লোকের নাম ছিল—কয়েকটি কড়ি, বোধ হয় তিনকড়ি টিনকড়ি হইবে, সেই ব্যক্তির মতামত লইয়া কথা হইতেছিল,—কেউ কেউ তাহার মতটির উপর খুব বেশী মূল্য দিতেছিলেন। রবিবাবু বলিলেন "উঁহার বাপ মায়ের চাইতে ও কি আপনারা উঁহাকে বেশী জানেন? তাঁহারা তো উঁহার প্রকৃত মূল্য ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন।" বহুকাল হইতেই তাঁহার দর্শন-কামী ব্যক্তিগণ বাড়ীতে ভিড় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিছুতেই উঠিতে চান না, স্নানের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তথাপি বসিয়াই থাকিবেন। একদিন ঐরূপ এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন,—আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাঁর নাম কি?" আমি বলিলাম "বসন্ত—" তিনি বলিলেন—"হয়েছে! 'বসন্তকে' উঠাবেন কি করে?" কথার এই চাতুরী তিনি মিষ্টভাবে—নিপুণ ভাবে এত বহুল পরিমাণে দেখাইয়া থাকেন, যে তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি শব্দটির প্রতি যে তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য—তাহা টের পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি 'চোখের বালি' লিখিতে সুরু করেন। একবার তিনি আমাকে বোলপুরে যাইতে সাদরআহ্বান পাঠাইয়া লিখিয়া-

ছিলেন—(১২ই বৈশাখ, ১৩০৯) "আপনি এবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্ত-নিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদক-ধর্ম্ম-সঙ্গত হইবে কি না, তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আর বিলম্ব করিবেন না—পুঁথি পত্র সহ লুপমেলের গাড়িতে চড়িয়া বসুন, তাহার পরে আর আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে?" কিন্তু 'চোখের বালি' তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন.বিনোদিনীর রহস্ত-নিকেতনে আমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। গোরার ও অনেকটা ছাপা হইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রেম খুব বড় বড় তুলিতে মোটা মোটা রেখায় আমাদের সাহিত্যে ইতি পূর্ব্বে আঁকা হইয়াছে। খুব গভীর ভাবের সঙ্গে অসামান্ত সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় বৈষ্ণব কবিরা দিয়াছেন,—কিন্তু বিনোদিনী প্রভৃতি চিত্রের মধ্যে যে খোদ-কারী আছে, তাহা একান্ত অভিনব, এ যেন ঢাকাই সেকরার তারের কাজ,—প্রেম জিনিষটাকে কারু-কার্য্যের এমন নিপুণ সৌন্দর্য্য দিয়া তিনি আঁকিয়াছেন, যে তাহা চোখ বাঁধিয়া দেয়। প্রেমিকার চুলের গন্ধ, পঠিত পুস্তকের উপর সুগন্ধ তেলের দাগ, এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোমল রেখা—স্বপ্নের জিনিষ, যেন অলক্তকের আলপনার মত, তাহা বিধিসৃষ্ট নারীকে নূতন করিয়া দেখাইতেছে।

এই শিল্প-কলা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনায়ন করিয়াছে। আমি নৌকাডুবি.চোখের বালি ও গোরা পড়ি নাই,রবিবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন আগ্রহে ইহার পূর্ব্বে কোন বই শুনি নাই। কবির লেখা গীত হয় নাই, বাদিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি বীণাবেণুর কথাই সর্ব্বদা মনে জাগাইয়া দিয়াছে—যেন বীণাপাণি নূপুর শিঞ্জিত পদে নৃত্য করিতে

346



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করিতে চলিয়া যাইতেছেন, এই পুস্তকত্রয়ের নর্ত্তনশীল গগ্য ছন্দের গতি আমার নিকট তেমনই বোধ হইতেছিল। আমি নৈতিক আদর্শের কথা আনিব না,—অপেক্ষাকৃত অল্পদরের লেখকরা যখন রসের নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয়—তখন সে রসেব নাম হয় বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতই যদি কেহ সুরসিক হন, তবে তিনি মানুষের মনটা লইয়া পুতুল খেলা খেলিতে পারেন—তাহাও কি আবার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে?

রবিবাবু দয়া করিয়া অনেকবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, একবার আমার ৫ বৎসরের পুত্র বিনয় তাঁর লম্বা চুল গুলি লইয়া মাথাটা রবিবাবুর পায়ের উপর রাখিয়া আবদার করিয়া ধরিয়াছিল, "আমায় বোলপুরে লইয়া যাও।" রবিবাবু তাকে বড় হইলে নিয়ে যাবেন, এই আশ্বাস দিয়াছিলেন। সে কথা এখনও তাঁর মনে আছে, ঐ ছেলেটির কথা অনেকবার তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন।

রবীন্দ্রবাবুর সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ—তাঁহার ভগবৎপ্রীতি, ইহাই তাহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, খেয়া প্রভৃতি কাব্যের ছত্র গুলিকে এত উজ্জল করিয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতি—তাঁহাকে মনুষ্য সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্য-সমাজ, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরস-সিক্ত করিয়া দিয়াছে—ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভায় স্ফুরিত আকস্মিক আলো নহে—ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা.—তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমার নিকট আছে; এই পত্রগুলিতে অনেকের মধ্যেই সেই সাধকের তপস্যা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একবার কোন লোক বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন।আমি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম,উত্তরে তিনি

লিখিয়াছিলেন (২০শে বৈশাখ ১৩০৯) "পত্রে আপনি যে কথার আভাস মাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটা আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধ করিয়াছি, কারণ লেখক-জাতির অভিমান সহজেই আঘাত পায়, অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজকে সেই গ্লানিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোন সুখ নাই, কোন শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষটার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবন প্রদীপের তেল ত খুব বেশী নয়, সবই যদি রোষে দ্বেষে হুহুঃ শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব?"

এই ক্ষমা ও উচ্চ প্রীতির ভাবই কবি-দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও রবীন্দ্রবাবুর মনে জাগিয়াছিল, তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন (১৩ই কার্ত্তিক ১৩১৩) "আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিষকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে, তাহার সমালোচনা ও তথৈবচ। তা ছাড়া সাহিত্য-সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না; সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে নাকি? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগে না, কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই জিতিয়াছি—আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।"

আমার ছেলে অরুণকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম। তাহাকে লইয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার একটা মনান্তর হইয়াছিল। দোষ হয়ত

আমারই ছিল, কিন্তু কোন কোন চক্রীলোক নানা অমূলক কথা আমার সম্বন্ধে প্রচার করিয়া এই মনোমালিন্যটা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু চিরকালই বন্ধুবৎসল, উদারপ্রকৃতি, তাঁহার মনের দুর্য্যোগ শীঘ্রই কাটিয়া যায়। এতদুপলক্ষে তিনি আমাকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। উত্তেজনার সময় কেহ নিজের দোষ স্বীকার করিতে চান না, কিন্তু রবিবাবুর দেবপ্রকৃতি সেই উত্তেজনার সময় কিরূপ বিনয় ও ক্ষমা ভূষিত হইয়া আমার চক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা সেই পত্রের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি "যদি অজ্ঞানে অথবা ভ্রমক্রমে আপনার মনোবেদনার কারণ হইয়া থাকি, তবে শত সহস্রবার আপনাকে প্রণিপাত করিয়া আপনার মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আমার দোষ যথেষ্ট আছে, সেজন্য সংসারে আমি প্রশ্রয় পাই নাই। প্রত্যাশাও করি না। আপনাদের সকলের কাছে পরমেশ্বর আমার মাথা হেঁট করিয়া দিন, আমাকে এমন জায়গায় দাঁড় করান যেখানে আপনাদের কৃপা পাত্র হইতে পারি, কিন্তু চিরদিন আপনাদের অসহ্য মনস্তাপের কারণ হইয়া আপনাদিগকে অন্যায়ে উত্তেজিত করিতে থাকিব, ইহাই না ঘটে, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা। আমি রাগ করিয়া আপনার সঙ্গে বিবাদ করিব না—আমি নত হইয়া আপনার বিচার গ্রহণ করিব।"

ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট এই মহান নতি কত বড় মহত্ত্বের পরিচায়ক! তাঁহার সুদীর্ঘ অনেক পত্র আমার কাছে আছে—অনেকগুলি হারাইয়াগিয়াছে, সর্ব্বত্রই তাঁহার উদারতা ও প্রীতি প্রতিবিম্বিত। যিনি খুব বড় রাজ্যের আবহাওয়া পাইয়া থাকেন, শুধু তিনিই এই ছোট রাজ্যে সেই উচ্চদরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারেন।

ইহার পর বহুবৎসর চলিয়া গেল। ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার সঙ্গ-সুখ

হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার নিকট সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট চিন্তার প্রেরণা--স্বর্গীয় শুভবার্ত্তার ইঙ্গিত। আমি প্রাচীন বঙ্গীয়কাব্য সমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলন করিব এইজন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন—(১৬ই কার্ত্তিক, ১৩১৩) "প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি, তাহা একান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে। স্থির করিয়াছিলাম, কয়েক মাস আমিই আপনাকে সাহায্য করিব,কিন্তু এখানে (বোলপুরে) নূতন ছাত্র ও রোগীদের জন্য ইমারত ঘর তৈরি করিতে হইতেছে, তাহাতে বিস্তর খরচ পড়িবে। অতএব এখন কিছুকাল আমার সম্বল কিছুই থাকিবে না। তাহার পর বহু ব্যয়ে বই ছাপাই এমন শক্তি আমার নাই। ত্রিপুরা হইতে অর্থ সাহায্য সম্প্রতি কোন মতেই প্রত্যাশা করা যায় না। নাটোরকে টাকার কথা বলিতে আমি কুণ্ঠিত। যদি গগনেরা এই ভার লইতেন, তবে বড় সুখের হইত।"

তাঁহার এষ্টিমেট্ ছিল লক্ষ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় খুব বৃহদাকারে পুস্তক না ছাপাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রভাবে "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই পত্র সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯১৪। রবীন্দ্রবাবু আমাকে কতটা সম্মান দিতেন, তাহা ব্যোমকেশের নিকট যে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যাইবে। উহা ১৯০৫ সনের ৭ই মার্চ্চ তারিখের লেখা। তিনি "সফলতার সদুপায়" নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"মিনার্ভায় চেয়ে কার্জ্জনে বেশী জায়গা আছে। আমার প্রবন্ধটির নাম "সফলতার সদুপায়"। সভাপতি মেজদাদা হইলে কোন মতেই চলিবে না। বরং নাটোরের মহারাজা হইলে ভাল। নতুবা হীরেন্দ্রবাবু, ত্রিবেদী মহাশয়, বা দীনেশবাবুকে

ধরিবে।" ব্যোমকেশ আমাকে ধরিতে আসিয়া চিঠিখানি আমার নিকট ফেলিয়া গিয়াছিল, তদবধি উহা আমার নিকটই আছে। আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম, সুতরাং রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্বের গৌরব পাইলাম না। তখনও আমি ইংরেজী কোন পুস্তকই রচনা করি নাই, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিয়া সাহিত্য রাজ্যের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম মাত্র, তথাপি রবীন্দ্রবাবু আমার সামান্য সাহিত্যিক গুণের এতটা পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তিনি অতি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন, ও রামায়ণী কথার শুধু ভূমিকা নহে, তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সাহিত্য এক একটা যুগের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগত ভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগ-লক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দ্দেশ করা বিধেয়। এক এক যুগের শিক্ষা দীক্ষার ঐতিহাসিক কারণ গুলি বিবৃত করিয়া কবিগণকে সেই শিক্ষা-দীক্ষার পাণ্ডা স্বরূপ দাঁড় করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গে সমস্ত জাতির চরিত্র নির্দ্দেশ করা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য—নতুবা কোন একটি লোককে—তাঁহার যুগ হইতে পৃথক করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান কালের নৈতিক কি সামাজিক রুচির মাপকাটি দিয়া বিচার করা সঙ্গত নহে। আমার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে কবিগণের আলোচনা কতকটা

ব্যক্তিগত ভাবে হইয়াছিল—কিন্তু ইংরেজী ইতিহাস খানায় রবীন্দ্র বাবুর উপদেশ অনুসারে আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তিনি শেষোক্ত পুস্তকের অবলম্বিত প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে সকল কবি ঝড়ের মত তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবের আতিশয্যে পাঠক-চিত্তকে উলট-পালট ও অভিভূত করিয়া ফেলেন—রবীন্দ্র তাঁহাদিগের অনুরক্ত নহেন। তিনি সেই সকল কবির পক্ষপাতী যাঁহারা বর্ণিত বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়া নিজকে একবারে আড়াল করিয়া রাখিতে পারেন,—এই জন্য তিনি বাইরণ জাতীয় কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না, বাল্মীকির মত বিষয়ে-গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মহারা কবির অনুরাগী।

১৯০৯ সনের শীতকালে একবার বোলপুরে গিয়াছিলাম। অরুণকে সেই খানে পাঠাইবার পর মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আমি যাইতাম। অতবড় খোলা জায়গা কখনই আমাকে আকর্ষণ করে না, এসম্বন্ধে অনেকের সঙ্গে আমার মত-ভেদ,—যার যেরূপ রুচি, কি করিতে পারা যায়, আমার কাছে পল্লী ভাল লাগে,আশ্রম ও শূন্য ময়দানে গেলে আমার প্রাণ হা হা করিয়া উঠে।

সেই বার নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রকে তথায় দেখিলাম। কেহ না বলিয়া দিলে তিনি রাজা কি প্রজা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি ছোট বড়র তারতম্য করেন না, সকলের সঙ্গেই গলায় গলায় ভাব, —সাহিত্যিক শক্তি ভগবান তাঁহাকে এতটা দিয়াছেন, যে তাঁহার লেখা পড়িলেই যে তিনি একজন শক্তিশালী লেখক তাহা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়— গদ্য লেখায় তিনি প্রচুর কবিত্বের আমদানী করেন, সেই কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষম কবি-দৃষ্টি ও হৃদয়ের কৌমার্য্য ধরা পড়ে। তাঁহার রাজত্ব যতটা তদীয় বিশাল ভূখণ্ডের উপর, তাহা অপেক্ষা বহু সংখ্যক বন্ধু হৃদয়ের উপর বেশী। বন্ধুবর্গ লইয়া কৌতুক ও আমোদ করিয়া

তিনি নিত্য উৎসবের সৃষ্টি করেন, সেই উৎসব হরি-লুটের মত, ছোট বড় কেহই প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয় না। বোলপুর গিয়া আমার ফিটের পীড়া হইল, কতকটা সময় অজ্ঞান হইয়া রহিলাম—জ্ঞানলাভের পর দেখিলাম মহারাজ জগদীন্দ্র শিয়রে বসিয়া। তিনি রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে একটা নূতন মজার ফন্দী পাকাইতেছিলেন। কতগুলি নূতন কাপড় আনিয়া ছোপ দিয়া গেরুয়া রং ধরাইলেন, একতারা ও খঞ্জনীর ব্যবস্থা হইল। মতলবটা এই হইল, মহারাজা গেরুয়া পরিয়া গুরু সাজিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবেন, রবিবাবু ও শিবধন বিদ্যার্ণব চেলা সাজিয়া একজন খঞ্জনী ও অপরে একতারা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিবেন। শিবধনের বয়স ছিল ত্রিশ এবং তিনিও সুকণ্ঠ ছিলেন। কোন একটা গাছতলায় মৌনী বাবা বসিয়া থাকিবেন,আর চেলারা পল্লীতে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া যাহা আনিবেন, তাহাই শিবধন রাঁধিয়া সকলের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। গুপ্তভাবে একখানা গো-শকট অপেক্ষা করিতে থাকিবে। চার পাঁচ পল্লী পর্য্যটন করিবার পর ঐ গোযানে আরোহণ করিয়া মহাপুরুষেরা আবার অন্য এক কেন্দ্রে গমন করিয়া ভিক্ষুধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। এই অভিযানে মোট ১৫ দিন ব্যয় করিয়া তাঁহারা বোলপুরে ফিরিবেন। শিবধন আমার নিকট অনেক কান্নাকাটী করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "রাজা মহারাজার খেয়াল,—এঁরা এত কষ্ট সইতে পারিবেন কেন? কোথায় কোন পল্লীতে যাইয়া হাল্লাক হইয়া পড়িবেন, তখন আমার খিদমদগারী করিতে হইবে, এবং এরূপ ভারি ভারি লোকের বাহন হওয়ার বিপদে তাল রাখিতে হইবে। গণদেবতারা যে মুষিকটির কাঁধে কেন চাপিতেছেন, বুঝিতে পারি না।" কিন্তু প্রকাশ্যে মহারাজার প্রতিকূলতা করা তাঁহার সাহসে কুলায় নাই, যখনই মহারাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কি হে পণ্ডিত—এতবড় একটা আনন্দ প্যাঁচার মত মুখ করিয়া মাটি করিয়া

ফেলিবে নাকি ?" তখন শিবধন ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিয়াছেন— "না মহারাজ, রাজেন্দ্র সঙ্গমে—দীন যথা ধায় দূর তীর্থ দরশনে।" কিন্তু সে যাত্রা এই মতলব টিকিল না। রবীন্দ্রবাবু অসুখ করিয়া বসিলেন। যতই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—ততই বোধ হয় জঙ্গলে জঙ্গলে হিমের মধ্যে নগ্নপদে ঘুরিবার আশঙ্কায় তাঁহার শরীর খারাপ হইল—শেষে সর্দ্দি ও পরে জ্বর করিয়া বসিয়া বোলপুরের মাঠে প্রস্তাবটি মাটি করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজা কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে বৈষ্ণব সাজিয়া গিয়া নিজের ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া রাণীমহাশয়কে গান শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য যতীনবসু প্রভৃতি দলের বন্ধুরাই পুরোভাগে ছিলেন— তাঁহারা ঘটা করিয়া তিলক কাটিয়া গুম্ফ কামাইয়া, তুলসীর মালা ধারণ পূর্ব্বক—ছদ্মবেশটার ভূমিকা খুব উৎকৃষ্ট ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণববেশী মহারাজও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাড়ীর কেউ মহারাজাকে এপর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই।

শান্তিনিকেতন হইতে গো-শকটে বোলপুর রওনা হইলাম, দুপ্রহরের সময়। তখন চটীপায় মহারাজা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—আমি অতিশয় কুণ্ঠার সঙ্গে বলিলাম "মহারাজ, আমি গাড়ীতে, আর আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, এটা বড়ই বিসদৃশ দেখাইতেছে। তিনি বলিলেন "তুমি যে রাজ-তক্তায় যাচ্ছ, তার লোভ দেখাইয়া আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিও না।" দেড় মাইল পদব্রজে হেঁটে তিনি ছুটখানে থেকে ওক্লাসের টিকিট কিনে আমার সঙ্গে তাঁহার ছেলেদের মাষ্টার রজনীবাবুকে দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। আমি পীড়িত, এজন্য একা আমাকে ছাড়িয়া দিলেন না। ইহার বহুদিন পরে বোধ হয় ১৯১৫ সনে হইবে, কৃত্তিবাসের জন্মোৎসব সম্পাদনার্থে ফুলিয়া গ্রামে একটা মহতী সভার অধিবেশন হয়, তাঁহার

সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার আশুতোষ। আমি, জলধর দা (হিমালয়-লেখক), খগেনবাবু (অধ্যাপক), আর কয়েকজন সাহিত্যিক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলাম। হঠাৎ মহারাজ জগদীন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে অবতরণ করিয়া আমাদের কামরায় আসিলেন এবং বলিলেন "একা একা প্রাণ হাঁকিয়ে উঠ ছিল, বাঁচলুম," এই বলিয়া আমার দিকে বিস্ময়সূচক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটু বিস্ময়ের বিষয় যে না হইয়াছিল তাহা নহে, আমি তাঁহার দৃষ্টির বেগে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম। আমার পরণে ছিল একখানি ভাল কোঁচান ঢাকাই ধুতি, গায়ে একটা নূতন শিল্কের পঞ্জাবী ও ভাল ফুলদার শিল্কের চাদর, পায়ে এক জোড়া নূতন পম্পসু ছিল এবং পথে এক বন্ধু আমার জামার একটা বোতামের কাছে সপত্র একটা মল্লিকা ফুলের গুচ্ছ আটকাইয়া দিয়াছিলেন,। হাতে একখানি সরু রুপার মুখ ছড়ি ছিল। মহারাজ সকল ভুলিয়া আমার রূপ মাধুরী পান করিতে লাগিলেন, আমি প্রমাদ গণিলাম। তখন তিনি গোপনে যতীনবসুকে উস্কাইয়া দিলেন, তাঁর বামাকণ্ঠ অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি ব্যাঘ্রবৎ লাফাইয়া উঠিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাহ-মঙ্গল গাইতে লাগিলেন। আমি হইলাম বর—আর স্বয়ং মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলে মিলিয়া দোহারী করিতে লাগিলেন, কখনও আমার মুখের কাছে আঙ্গুলগুলি নানারূপ মুদ্রার ছলে ঘুরাইতে লাগিলেন, কখনও "বাহাবা"'র সঙ্গে উচ্চহাস্যে আমার হৃদকম্প উপস্থিত করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহারা আমাকে লইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমার একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া আছে। জলধর দা অতি নীরিহ ভাল মানুষ, কিন্তু সেদিন মহারাজের উত্তেজনায় তিনিও ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কানে একটু খাটো, এইজন্য বোধ হয় এইরূপ সচীৎকার উৎসব তাঁর খুব পছন্দ হয়, কারণ শুধু কথাবার্তা বলিলে অনেক কথা

তাঁহাকে এড়াইয়া যায়। তার পর যখন ফুলিয়ার নিকট যাইয়া গাড়ী থামিল—তখন মহারাজার প্রবর্ত্তনায় সকলে মিলিয়া আমার গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

২।৩ বৎসর হইল বেহালা মহাকালী পাঠশালায় পুরস্কার বিতরণে সভাপতিত্বে আহ্বান করিয়া আমি চৌরঙ্গীতে মহারাজার সঙ্গে সন্ধ্যা ৮—৩০ টার সময় দেখা করিয়াছিলাম। তখন দরজায় খাড়া পাহারা রাখিয়া মহারাজা আমাকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন, ফলে আমাকে ট্রাম না পাওয়াতে গাড়ী করিয়া বেহালা যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল উৎপাৎ যে কত মধুর—তাহা কথায় বুঝাইবার নহে। ভাগবতের ৯ম ১০ম স্কন্ধেতো এই সকল উৎপাতের কথা লইয়াই! এমন শিশু-সুলভ কমনীয়তা আমি আর কাহারও দেখি নাই—কি লেখায়, কি ব্যবহারে—কি সহৃদয়তায়। একদিনে তিনি যেন কতদিনের আপনার হইয়া পড়েন। রাজরাজেশ্বরের এই ধূলিখেলা দেখিয়া তাঁহারই কথা মনে পড়ে যিনি মথুরার রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়া গোবাঁধন-দড়ি-পরা সখাদের জন্ত কাঁদিয়া ছিলেন। এই একটি মানুষ দেখিয়াছি যিনি অবস্থার তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিয়া কেবল মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। গতবৎসর রামমোহন রায় হলে খগেন্দ্রবাবু (অধ্যাপক) বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই সভায় মাননীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল, তিনি কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধুত্বাভিমানী এই দীনলেখককে সভাপতির আসনে একরূপ বলপূর্ব্বক তাহার সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা তাড়াইয়া বসাইয়া দিলেন। এতাদৃশ ব্যক্তির সান্নিধ্যে আমি লজ্জানত শিরে তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়াছিলাম।

ভারতী ও বঙ্গদর্শন।

আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা, ভারতী তখন শ্রীমতী সরলা দেবীর হাতে ছিল। তখনকার নানাবিধ আন্দোলন ও সভা সমিতির সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তিনি পত্রিকাখানির জন্য চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন না, আমার উপর প্রায় সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতাম ও নিজে লিখিতাম, তাহা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে "মহতাশ্রমের" পার্শ্বে একখানি দোতালা বাড়ীর উপরে বসিয়া তিনি বেলা ৩টা হইতে ৫॥ টা পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুইদিন শুনিতেন; এই বাড়ী হইতে বাবু কেদার নাথ দাস গুপ্ত তাঁহার "ভাণ্ডার" নামক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাড়ীটীতে ভারতীর কাজ কর্ম্মের জন্য একখানি ঘর ছিল, এই ঘরে কোন কোন সময় সহিত্যিক সুহৃদবর্গের মিলন হইত। এই খানে শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ভারতী-সম্পাদিকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই ঘরে কেদার বাবু প্রায়ই আসিয়া রবিবাবুর কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমার মন বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেন বলিয়া আমি সম্পাদিকাকে কহিয়া তাঁহার প্রবেশ মানা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। নানারূপ ফল ও উপদেয় সন্দেশাদির উপঢৌকন লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিতেন ও আমাদের আইন-কানুন রদ করিয়া দিতেন।

এত দূরে আসিয়া সম্পাদিকার ভারতীর কাজ করিবার কারণ এই যে, তাঁহার বাড়ী বালিগঞ্জ আমার বাড়ী শ্যামবাজার হইতে বহুদূর; এজন্য প্রথম কয়েক মাস বালিগঞ্জে ঘন ঘন যাতায়াত করার পর বালিগঞ্জ-

যাওয়ার পক্ষে অসুবিধা জানাইয়াছিলাম, এজন্যই এই নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

ভারতী-সম্পাদিকা কাজের ভার প্রায় সমস্তই আমার উপর ছাড়িয়া দিলেও পত্রিকাখানির উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রবন্ধ লিখিবার বেশী অবসর পাইতেন না, কিন্তু আয় ব্যয়ের খবরটা তিনি রাখিতেন; এসম্বন্ধে ভার ছিল কেদার বাবুর উপর। সম্পাদিকা নিজে যেটুকু লিখিতেন তাহা চমৎকার হইত। কোন কোন সময় পুস্তক সমালোচনা করিতেন। তিনি অতি অল্প কথায় ভাবের সমাবেশ করিতে জানেন, তাঁহার লেখায় বাক্য-পল্লব ও বৃথা কথার আড়ম্বর আদৌ নাই, হঠাৎ ছবির মত সুন্দর দৃশ্য তাঁহার রচনায় ভাসিয়া উঠে। যাহাতে তাঁহার এই লিপি-কুশলতায় ভারতীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, এজন্য আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে তাগাদা করিয়া বিরক্ত করিতাম, এই বিরক্তির ফলে তিনি ক্রমাগতঃ প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতেন। কিছু লিখিতে বসিয়াছেন, অমনই রাণী মৃণালিনী আসিলেন, কিম্বা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী আসিলেন, নিদেনপক্ষে যোঁড়াসাঁকোর ৫ নং, বা চৌধুরী-বাড়ীর নিমন্ত্রণ ত আসিবেই। এই ভাবে অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত।

নূতন সাহিত্যিক দলের মধ্যে শ্রীমান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বালিগঞ্জের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন। তখন মণি তরুণ বালক। মণিকে যেদিন আমি প্রথম দেখি, সেই দিনই আমি তাহার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানি ও সুন্দরমূর্ত্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। মণিলাল সরলাদেবীকে ভয় করিতেন। তাঁহার কয়েকটী কবিতা তিনি গোপনে আনিয়া আমাকে দেখান, তাঁহার আশঙ্কা ছিল সরলাদেবী কবিতা লেখার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন। সেই সন্তর্পিত, অতি লজ্জিত লেখকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়েকটি কবিতা আমার বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল। একটি ভারতীতে ছাপাইলাম। সরলা

দেবী তাহার পর বলিলেন "আপনি করিয়াছেন কি? ছেলেটার আখের নষ্ট করিতে দাঁড়াইয়াছেন। ইহার পর এ'কে কবিতার রোগে পাইয়া বসিবে" কিন্তু মণির কতকগুলি কবিতা আমি সম্পাদিকাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তাঁহার মুখে প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন "তা আমি আগেই জানিতাম, মণির রচনা শক্তি আছে। কিন্তু সে এখনও বালক, ইহা স্মরণ রাখিবেন।" কিন্তু ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিমাসেই মণির কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। আজ শ্রীমান মণিলাল ভারতীর সম্পাদক, তাঁহার রচনার সরল মাধুর্য্য এখন অনেক লেখক অনুকরণ করিতে প্রয়াসী, আমি এই ঘটনায় বিশেষ প্রীত, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতীর অন্যতম সম্পাদক সৌরীন্দ্রবাবু কলেজ পড়ার সময় ভবানীপুরের সাহিত্যসমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে প্রায়ই লইয়া যাইতেন, তখন জানিতাম না ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। সেই সময় প্রিয়দর্শন, সদাপ্রফুল্ল চারু বন্দোপাধ্যায় ভারতীর পতাকার নীচে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই তরুণের দল এখন লিপি চাতুর্য্যে প্রবীণের দলকে ছাপাইয়া উঠিতে প্রয়াসী। কিন্তু যেদিন ইহাঁরা উদ্দাম উৎসাহ লইয়া সবিনয়ে সাহিত্যিক দলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেদিনের কথা মনে পড়িলে আনন্দ হয়।

এই সময় নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শনের সঙ্গে ও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। রবিবাবু অনেক সময় বোলপুরে থাকিতেন; শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে কাগজের তাড়া লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইতেন। রবিবাবুর উদ্যোগে বঙ্গদর্শন চালাইবার জন্য ও সাহিত্যিক চর্চ্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম।

'রবিবাবু যখন অনুপস্থিত থাকিতেন, তখন এই আড্ডায় যতীনবাবু অনেক সময় তাঁহার কীর্ত্তন ও কথকতার নকল শুনাইয়া আমাদিগকে হাসাইতেন। শৈলেশবাবুর নধর-কান্তি আজ আমার চক্ষের সাম্‌নে ভাসিতেছে। তাঁহার মুখ হইতে সোজা লাইন নীচের দিকে টানিলে ভুঁড়িটা অন্তত এক ফুট দূরে প্রমাণিত হইত। এই ভুঁড়ি দোলাইয়া হাসি মুখে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন, তখন বন্ধুবর্গের আনন্দের সীমা থাকিত না। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে সকলের বিদ্রূপের লক্ষ্য হইতেন শৈলেশবাবু, বোধ হয় তাঁহার অমায়িক চরিত্র ও নিরীহতা এই বিদ্রূপ আমন্ত্রণ করিত; কেহ বা তাঁহার দেহের পরিসর লক্ষ্য করিতেন, কেহ বা তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, বিশেষ হিসাব-রক্ষার বন্দোবস্ত লইয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন। শৈলেশবাবু উত্তরদিতে ছাড়িতেন না, তিনি সকল ঠাট্টাতেই আমোদ অনুভব করিতেন; যেগুলি নিতান্ত তীব্রভাবে তাঁহার গায়ের উপর পড়িত তাহাতেও তিনি হাসিতেন। এমন উদারচেতা ভোলা-মহেশ্বর সংসারে কমই আছে। বঙ্গদর্শনের লেখকবর্গকে তিনি মুক্তহস্তে টাকা দিতেন,—অর্থাৎ যখন হাতে টাকা থাকিত। এই ব্যক্তি অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানি না,হিসাব-সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁহার মত মুক্ত-হস্ত ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল, নিজের হউক, পরের হউক টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না, অথচ যাঁহাদের নিকট হইতে ধার করিতেন, তাঁহারা কিছুতেই নির্ম্মম হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে চাহিতেন না। একজনকে আমি জানি, তিনি শৈলেশবাবুকে ৩০০০৲ টাকা ধার দিয়াছিলেন; শৈলেশবাবুর কাছ হইতে কোন ক্রমেই তিনি তাহা আদায় করিতে পারিলেন

না, অথচ মেয়াদ চলিয়া যায়। ঋণদাতার অবস্থাও খুব সম্পন্ন ছিল না,—কিন্তু তথাপি তিনি নানা লোকের উত্তেজনা পাইয়াও টাকার জন্য নালিশ করেন নাই, তিনি যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। "শৈলেশ কাহাকেও ঠকাইবার মতলব করে না, পরের উপকারের জন্য সে সর্ব্বদা উদ্যত, তাহার দেব-চরিত্রের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার হাতে টাকা না থাকিলে কোথা হইতে দিবে? আমি এরূপ লোককে লাঞ্ছনা করিতে কখনই অগ্রসর হইব না।";

শৈলেশবাবুর "দাদার কাণ্ড" যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন তাঁহারা গল্প লিখিবার কেমন সুন্দর ক্ষমতা ছিল, তাঁহার "চিত্র-বিচিত্র" অতি চমৎকার পুস্তক। আমার মনে হয়, তাঁহার দাদা শ্রীশ মজুমদার মহাশয় হইতে তাঁহার নিজের লিপি-শক্তি কম ছিল না। ভগবান তাঁহাকে বেশ উচ্চদরের প্রতিভা দিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক আসরে শৈলেশবাবু এমন নিরীহ ভাবে, এমন বিনীত হইয়া থাকিতেন, যেন তিনি সকলের চেয়ে কত নীচু! এই অনাড়ম্বর ভাবটা তাঁহার চরিত্রটিকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। একবার শৈলেশবাবু বড় সাহসিকতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক; তাঁহার নামের নীচে শৈলেশ ভায়া নিজের নামটি "সহ-সম্পাদক" বলিয়া ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"সহ-সম্পাদক" নহে "দুঃসহ-সম্পাদক"—একথা পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি। আমি তাঁহার ঠাট্টাটি মনে গাঁথিয়া রাখিলাম এবং যখন তখন তাঁহাকে "দুঃসহ-সম্পাদক" বলিয়া পরিহাস করিতাম। শৈলেশবাবু যথারীতি বাহিরে হাসিতেন বটে, কিন্তু ঠাট্টাটি তিনি বেশ আমোদকর বলিয়া বোধ হয় মনে করিতেন না। কারণ এই উপাধি যিনি দিয়াছেন, তাঁহার কথা পাছে এই প্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সভয়ে তিনি কথা অন্য-দিকে পাড়িতে চেষ্টা করিতেন।

একবার শৈলেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমিও বড় জব্দ হইয়াছিলাম। যেদিন খাওয়াইবার কথা ছিল তাহার ২।৩ দিন আগে আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলাম। নানা কার্য্যের বাহুল্যে আমি একেবারে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেদিন বেলা ১২টার সময় খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া আমি আমার গল্পের বই "তিনবন্ধুর" প্রুফ দেখিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম 'ধীরকুঞ্জর, গতিমন্থর'' শৈলেশবাবু বাহু এবং দেহ দোলাইতে দোলাইতে আসিতেছেন। গৃহদ্বারে তাঁহাকে দেখিয়াই আমার নিমন্ত্রণের কথা মনে হইল এবং মুখ শুকাইয়া গেল। তখন বাড়ীর সকলেই খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। যে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাঁড়ির একটি শাক কণা লইয়া বিপদে তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আতঙ্কিত ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলাম "এই যে শৈলেশ বাবু, আসুন, এত দেরি হইল যে?" শৈলেশ ভায়া আমার মুখ দেখিয়াই মৌখিক ভদ্রতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া বাজারের লুচি-সন্দেশ খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। শৈলেশবাবু ইহার একদিন প্রতিশোধ লইতে চাহিয়া ছিলেন। তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। *

শৈলেশের সহস্র ত্রুটি থাকা সত্বেও সকলেই তাঁকে ভালবাসিতেন। 'বঙ্গদর্শন' লইয়া রবীন্দ্রবাবুর একটা ক্ষতির কারণ দাঁড়াইয়া ছিল ১৩১১ সনের ১৬ই বৈশাখে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আপনি বোধ হয় জানেন আমার গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুরকে দিয়াছি অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি। কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দশা হইত না, এইজন্ত এবং দুর্ভাগ্য শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।''

* এই আখ্যানের এ পর্যন্ত ভারতীতে একটি সন্দর্ভাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।